ছোটদের
অনেক রকম গল্প
62
B. Roy

ছোটদের

অনেক রকম গল্প

62

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

গল্পের নাম

এক রাজা। রাজা যেমন জ্ঞানী, তেমনি গুণী। সভার দেয়ালে সোনার বড় বড় অক্ষরে রাজা লিখন খুদিয়ে রেখেছেন—

যা করে ভাগ্য !

রাজা মারা গেলে তাঁর ছেলে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলেন। নতুন রাজা বললেন বৃদ্ধ মন্ত্রীকে—বাবার ও লিখন তুলে আমি ওখানে লিখবো—'যা করে মানুষ নিজের চেষ্টায় !' ও ভাগ্য আমি মানি না।

বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন—মাপ করবেন মহারাজ! স্বর্গীয় মহারাজ ছিলেন জ্ঞানী—জীবনে তিনি অনেক কিছু দেখে বুঝে তবে ও কথা লিখিয়েছিলেন। আপনি ছেলেমানুষ। জীবনে আপনি কতটুকু দেখেছেন যে ও লিখন পাল্‌টে দেবেন !

নতুন রাজা বললেন—বেশ, আমি ভাগ্য আর মানুষের চেষ্টার পরখ করবো।

নতুন রাজা আদেশ দিলেন—রাজ্যে সবচেয়ে কে দীন ভিখারী—খুঁজে তাকে আনো, আমি তাকে ধনসম্পদ দিয়ে তার দুর্দশা ঘুচিয়ে দেবো।

রাজার আদেশে তিনজন শান্ত্রী বেরুলো দীন-দুঃখীর সন্ধানে। ঘুরে ঘুরে তারা পেলো নগরের ফটকের ধারে এক রোয়াকে বসে ভিক্ষা

করছে এক ভিখারী। রোজ সামান্য যে-ভিক্ষা পায়, তাতেই একবেলা খেয়ে অতি কষ্টে তার দিন কাটে।

কোনো কথা না বলে শান্ত্রীরা তাকে নিয়ে এলো রাজার সভায়। সে-বেচারা ভয়ে কাঁপছে! কী অপরাধ করেছে, যার জন্যে রাজার সেপাই-শান্ত্রীরা তাকে ধরে নিয়ে এলো?

কাঁদতে কাঁদতে সে বললে—আজ্ঞে, আমি কোনো অপরাধ করিনি মহারাজ।

রাজা বললেন—কেঁদো না। তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার এই ভিখারীর দশা আমি ঘুচোবো। তুমি হবে আমার সভার সভাসদ। ঘর পাবে, বাড়ী পাবে, দাসদাসী পাবে—অনেক ধনরত্ন পাবে। আমার পাশে বসে আজ রাত্রে খাবে।

ভিখারীর দুচোখ কপালে উঠলো! সে ভাবলো, স্বপ্ন দেখছি না কি? কিন্তু না, স্বপ্ন নয়—চোখে স্পষ্ট দেখছে রাজার সভা, সিংহাসনে বসে রাজা........অমাত্য সভাসদের দল।

রাজার হুকুমে লোকজন ভিখারীকে নিয়ে গিয়ে গোলাপজলে স্নান করিয়ে দিলে........ভালো পোষাক পরিয়ে দিলে, তারপর রাজা তাকে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন বিরাট ভোজ।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাজা তাকে দিলেন মোহরের একটি থলি। দিয়ে বললেন—আমার লোকজন এখন তোমাকে তোমার পুরীতে নিয়ে যাবে—সেখানে তোমার ঘর আছে, বিছানা আছে—রাত্রে সেই বিছানায় ঘুমোবে। তারপর সকালে আমার লোকজন সাজপোষাক পরিয়ে তোমাকে সভায় নিয়ে আসবে।

তাই হলো। কিন্তু রাজার দেওয়া পুরীতে পালঙ্কে নরম বিছানায় শুয়ে তার চোখে ঘুম আসে না! এ-পাশ ও-পাশ করে অনেকক্ষণ কাটলো। তারপর সে পালঙ্ক ছেড়ে উঠে খোলা জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো।

আকাশে চাঁদ নেই। নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি। এ পুরী........তার

মনে হতে লাগলো গারদ-ঘর! এখানে যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!

রাজার দেওয়া মোহরের থলি নিয়ে সে বেরুলো পুরী থেকে…… নিঝুম পুরী, সেপাই-শান্ত্রীরা ঘুমোচ্ছে। অন্ধকার রাত্রি। বেহুঁশের মতো ভিখারী চলেছে পথে। কোথায় চলেছে, খেয়াল নেই। সোজা সে চলেছে। নদীর ধারে এলো। নদী বলে বুঝলো না, এমন অন্ধকার—পথ ভুলে সে পড়লো নদীর জলে—পড়ে ডুবে গেল!

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঢেউয়ের দোলায় মোহরের থলি সমেত ভিখারীর দেহ এসে লাগলো নদীর কিনারায়। ভিখারী অজ্ঞান, অচেতন।

দুজন জেলে জাল ঘাড়ে করে নদীর ধার দিয়ে চলেছে—তারা দেখলো, কিনারায় মানুষ পড়ে আছে। দেখে তারা তাকে ধরে নাড়াচাড়া করলো; কোনো সাড়া নেই! তারা ভাবলো, মানুষটা মরে গেছে! তারা তখন তার পোষাক-আশাক খুলে নিয়ে নিজেদের একটা গামছা তাকে পরিয়ে দিলে—সঙ্গে সঙ্গে তার মোহরের থলি নিয়ে জেলেরা চলে গেল।

তারপর সকাল হলো। ভিখারীর জ্ঞান হলো। জ্ঞান হতে সে দেখে, তার সে-পোষাক-আশাক গায়ে নেই, পরণে ছেঁড়া ময়লা গামছা —সে মোহরের থলিটিও নেই। ভিখারী ভাবলো, নাঃ, তাহলে সে স্বপ্নই দেখছিল। উঠে সে তার সেই চিরদিনের চেনা ফটকের ধারে সেই রোয়াকে এসে বসলো ভিক্ষা করতে।

ওদিকে পুরীতে সকালে ভিখারীকে পাওয়া গেল না। রাজা দিলেন হুকুম—সন্ধান করে তাকে নিয়ে এসো। আনা চাই।

সেই তিনজন শান্ত্রী চললো ভিখারীর সন্ধানে।

রাজা বললেন বৃদ্ধ মন্ত্রীকে—আশ্চর্য! যা করতে গেলুম, মানে, তার ভালো করতে গেলুম। কী তার হলো, জানা দরকার।

ভিখারীকে তারা পেলে ফটকের ধারে সেই রোয়াকে। রোয়াকে বসে সে ভিক্ষা করছে—তার পরণে ছেঁড়া গামছা।

রাজার শান্ত্রীরা তাকে ধরে রাজার সভায় নিয়ে এলো। ভিখারী তখন রাজাকে বললে তার কাহিনী।
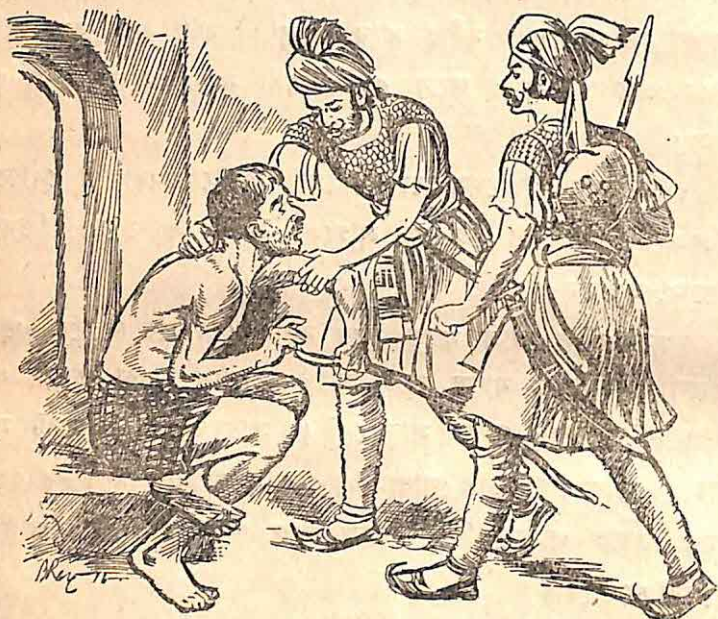
কোন কথা না বলে শান্ত্রিরা তাঁকে নিয়ে গেল।

বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন—দেখলেন তো মহারাজ! আপনি ভাগ্য ফেরাতে পারলেন?

রাজা বললেন—এবারে ওর প্রাণ নিয়ে পরখ করবো, দেখি, ওর ভাগ্য ওকে মরণ থেকে বাঁচাতে পারে কি না।

রাজার হুকুমে তখন বড় একটা কাঠের বাক্স আনা হলো। সেই বাক্সে কতকগুলো ফুটো করা হলো। তারপর রাজার হুকুমে ভিখারীকে সেই বাক্সে বন্ধ করে রাজা হুকুম দিলেন—উঁচু পাহাড় থেকে এই বাক্স সমুদ্রের জলে ফেলে দাও!

রাজার লোকজন সেই বাক্স নিয়ে উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠে বাক্সটা

সাগরের জলে ফেলে দিলে। ঢেউয়ের দোলায় ভাসতে ভাসতে বাক্সটা বহুদূরে ডাঙ্গার কাছে এক পাহাড়ে পেলো ধাক্কা—সেই ধাক্কায় বাক্সর ডালা গেল ভেঙ্গে; ভিখারী তখন বেরুলো বাক্স থেকে। বেরিয়ে ডাঙ্গায় উঠে দেখে, নির্জন দ্বীপ—কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই! আশ্রয়ের জন্য ঘুরতে ঘুরতে সে এলো এক পুরীর সামনে। নির্জন পুরী। পুরীর ফটকে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'এ পুরীতে যে প্রবেশ করবে তার মরণ নিশ্চয়'! ভিখারী মুখ্যু মানুষ—লেখাপড়া জানে না, লেখা সে পড়বে কি? সে ঢুকলো পুরীর মধ্যে। ঢুকে দেখে পুরীতে জনমানবের চিহ্ন নেই! প্রকাণ্ড পুরী। এঘর ওঘর পার হয়ে অবশেষে প্রকাণ্ড এক ঘরে এলো। শ্বেত-পাথরের তৈরী দেওয়াল—পাথরের উপর মণিমুক্তা বসানো ঘরের মাঝখানে একটা সিংহাসন—সেই সিংহাসনে বশে এক রূপসী কন্যা। কন্যার মাথায় রত্নমুকুট—পরণে দামী শাড়ী—শাড়ীতে জরি চুমকি ঝক্ঝক্ করছে! কন্যার হাতে রাজদণ্ড। আর তার আশেপাশে আমাত্য সভাসদের দল এবং অনেক রূপসী সহচরী।

ভিখারী একেবারে থ! ভাবলো, আবার স্বপ্ন দেখছে না কি?

কন্যা বললেন—দাঁড়িয়ে আছো কেন?—এসো, তোমার জন্য আমরা কতকাল যে অপেক্ষা করছি!

ভিখারী অবাক! তার জন্যে অপেক্ষা করছেন এক রাজকন্যা! ভিখারীর মুখে কথা নেই! কন্যা বললেন—পুরীর ফটকে লেখা আছে, এ পুরীতে যে প্রবেশ করবে, তার মরণ নিশ্চয়! কত কত বীর সেনাপতি, কত কত রাজপুত্র এখানে এসেছিল; কিন্তু পুরীর ফটকে ঐ লেখা দেখে ভিতরে ঢুকতে সাহসী হয় নি। তুমি প্রথম এই পুরীতে প্রবেশ করলে।

রাজকন্যার আদেশে ভিখারীকে নিয়ে গিয়ে সভাসদেরা স্নান করালো—তারপর রাজবেশ পরিয়ে তাকে নিয়ে এলো সভায় কন্যার সামনে।

রাজকন্যা বললেন—আমি পণ করেছিলুম, ঐ লেখা দেখেও যে মানুষ সাহস করে পুরীতে প্রবেশ করবে, সে ভিখারী হোক, চণ্ডাল হোক, তাকে আমি বিবাহ করবো। আমি এ রাজ্যের রাণী। যাকে বিবাহ করবো সে হবে এ রাজ্যের রাজা। তুমি এখানে থাকবে। বিবাহের আয়োজন করি। বিবাহ হলে তুমি বসবে এ সিংহাসনে রাজা হয়ে।

ভিখারীকে খাতির-যত্ন করে পুরীতে রাখা হলো। তার সঙ্গে হলো রাজকন্যার বিবাহ।

বিবাহে যত দেশের রাজরাজড়ার হলো নিমন্ত্রণ। যে রাজ্যে সেই ফটক থেকে ভিখারীকে আনিয়ে রাজা আমাত্য করেছিলেন তারপর কাঠের বাক্সে পুরে সাগরের জলে ফেলিয়েছিলেন—সে রাজাও এলেন নিমন্ত্রণে।

তিনি ওদিকে তখন সভায় তাঁর বাপ-রাজার লিখন পাল্‌টে লিখেছেন, 'যা করে মানুষে নিজের চেষ্টায়।'

সে রাজা ভিখারীকে চিনলেন। তিনি শুনলেন তার কাহিনী।

তারপর বিবাহের নিমন্ত্রণ সেরে রাজা ফিরলেন নিজের দেশে; এসে বৃদ্ধ মন্ত্রীকে বললেন—সেই ভিখারী—যার ভাগ্য ফেরাতে আমি পারি নি। যখন তার প্রাণ নিতে চেষ্টা করলুম, তখন সে হলো এক রাজ্যের রাজা।

বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন—এখন বুঝলেন মহারাজ, কেন স্বর্গীয় মহারাজ ওকথা লিখিয়েছিলেন।

রাজা বললেন—হ্যাঁ, বুঝেছি। আমার লিখন মুছে দিয়ে ওখানে লেখান 'যা করে ভাগ্য।

এক বামুন আর বামনী। বামুন ভারী গরীব। ভিক্ষা করে বামুন যা পায়, দিন আর তাতে চলে না। দুজনে একদিন যদি কিছু খায় তো, তার পর তিনদিন উপোস করে কাটে। গাঁয়ে ভিক্ষাও রোজ মেলে না। বামুন-বামনী ভগবানকে ডাকে—বলে, আর কিছু চাই না ঠাকুর—শুধু একবেলা করে দুটি খেতে পাই যেন।

গরীবদের ডাক ভগবানের কাণেও যায় না—বামুন আর বামনীর দুঃখও ঘোচে না।

দেশের রাজা এক মস্ত বাজার তৈরী করেছেন। রাজার ঢ্যাড়ায় ঘোষণা হলো দিকে দিকে এ বাজারে যারা জিনিষপত্তর বেচতে আসবে, দিনের শেষে কোনো জিনিষ বিক্রী না হয়ে যদি মজুত বাকি থাকে, তাহলে রাজার সরকার সে সব জিনিষ কিনে নেবে—কিনে রাজার ভাণ্ডারে তা জমা দেবে। তা যে-জিনিষই হোক—নোটে-পালং শাক থেকে হাতী-পর্য্যন্ত।

ঢ্যাড়া শুনে বামনী বামুনকে বললে—ডাঁটিশুদ্ধ কতকগুলো কলাপাতা জোগাড় করে আনো, আর সেই সঙ্গে মাটীর একটা বড় হাঁড়ি।

বামুন ঘুরে ঘুরে ডাঁটিশুদ্ধ ক'খানা কলাপাতা আর একটা মাটীর তিজেল হাঁড়ি নিয়ে এলো। বামনী তখন কলাপাতার ডাঁটিগুলো নিয়ে কুচি কুচি করে কাটলো—কেটে সেই তিজেল হাঁড়িতে ভরে হাঁড়ির মুখ কলাপাতা দিয়ে মুড়ে কলার ছেটো দিয়ে মজবুত করে বাঁধলো—বেঁধে বামুনকে বললে—এই হাঁড়ি নিয়ে গিয়ে বসো। কেউ যদি বলে—কি বেচতে এসেছো? তাহলে বলবে আমাদের যত দুঃখ-দুর্দশা বেচতে এনেছি। যদি বলে, কত দাম? তা বলো এক হাজার টাকা—তার এক পয়সা কম দিলে চলবে না।

হাঁড়ি নিয়ে বামুন এসে বাজারে বস্‌লো। বাজারে কত খদ্দের এসেছে, কত জিনিষ কিনছে। বামুনকে দেখে তারা বললে—তোমার হাঁড়িতে কি আছে গো? কি এনেছো বেচতে? বামুন বলে—আমার হাঁড়িতে আছে আমাদের যত দুঃখ-দুর্দশা—নেবে? এক হাজার টাকা দাম!

শুনে খদ্দেররা শিউরে সরে যায়, বলে—দুঃখ-দুর্দশা আবার নতুন করে কে কিনবে? একেই নিজের নিজের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে জ্বলে-পুড়ে মরছি—তার উপর আবার নতুন করে পরের দুঃখ-দুর্দশা কেনা!

হাঁড়ি নিয়ে বামুন সারাদিন বসে রইলো—কেউ তার দুঃখ-দুর্দশা কিনলো না।

দিনের শেষে বাজার ভাঙছে—দোকান-পশারীর দল টাকা গুণে গেঁজেয় ভরে যে যার বাড়ী ফিরছে—রাজার সরকার এলো তার পাইক পেয়াদা নিয়ে—কার কি জিনিষ বিক্রী হলো না, রাজার তরফ থেকে কিনে রাজার ভাণ্ডারে জমা পাঠাবে—

বামুনকে দেখে সরকার বললে—কি ঠাকুর—তোমার হাঁড়িতে কি আছে—বিক্রী হলো না?

বামুন বললে—আমার হাঁড়িতে আছে আমাদের যত দুঃখ-দুর্দশা—রাজার বাজারে বেচতে এসেছি—তা কেউ কিনলো না।

শুনে সরকার বললে—দুঃখ-দুর্দশা কি কেউ সখ করে কেনে ঠাকুর যে তুমি এসেছো তাই বিক্রী করতে।

বামুন বললে—আজ্ঞে, এ ছাড়া আমাদের এমন কিছু তো নেই যা বিক্রয় করে দু-পয়সা পাবো! তা বিক্রী হলো না যখন—কথাটা বামুন শেষ করলো না····সরকার বুঝলো।
রাজার ঢ্যাঁড়া দেওয়া আছে, যার যে জিনিষ বিক্রী হবে না রাজা তা দাম দিয়ে কিনবেন। আর এ বাজারে তাই হয়ে আসছে রোজ। তা বলে দুঃখ-দুর্দশা কেনা? তাই তো।

সরকার বললে—তুমি বসো ঠাকুর—তোমার দুঃখ-দুর্দশা বিক্রী হলো না—মহারাজের হয়ে দাম দিয়ে এ জিনিষ কেনা—এমন জিনিষ বিক্রীর কথা কখনো শোনা যায়নি তো—তা মহারাজকে একবার কথাটা বলি গিয়ে····

সরকার এলো ঘোড়ায় চড়ে, রাজার কাছে, এসে রাজাকে বললে, বামুনের কথা।

শুনে রাজা বললেন—তা হোক—আমি যখন কথা দিয়েছি—বাজারে বেচতে এসে যার যে জিনিষ বিক্রী হবে না—পড়ে থাকবে, আমি সে জিনিষ দাম দিয়ে কিনবো—তখন আমার সে কথার নড়চড় হতে পারে না। বামুন যখন তার দুঃখদুর্দশা বেচতে এনে বেচতে পারেনি, তখন ওর ও দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনতেই হবে। না হলে সত্যভঙ্গের পাপ হবে। তুমি যাও, দাম দিয়ে ওর দুঃখ-দুর্দশা কিনে নিয়ে এসো।
সরকার ফিরলো বাজারে—ফিরে বামুনকে বললে—বেশ, মহারাজা কিনবেন তোমার এ দুঃখ-দুর্দশা। তা এর জন্য দাম দিতে হবে কত?

বামুন বললে—এক-হাজার টাকা। তার এক পয়সা কম হলে চলবে না।

এক হাজার! শুনে সরকারের চোখ যেন ঠিক্‌রে পড়লো। সরকার বললে—একে তো দুঃখ-দুর্দশা কেনা—তার জন্য দাম দিতে হবে এক-হাজার টাকা। তুমি পাগল হয়েছো, ঠাকুর····

বামুন বললে—হুঁ—না মশাই, পাগল আমি নই। এর দাম দিতে হবে এক হাজার-টাকা।

মুস্কিল তো। সরকার আবার এলো রাজার কাছে—এসে হাত-যোড় করে বললে—দুঃখ-দুর্দশার জন্য বামুন দাম চায় মহারাজ—এক-হাজার টাকা।

শুনে রাজা বললেন—যে দাম চায়, তাই দেবে। না হলে সত্য-ভঙ্গের পাপ হবে।

সরকার আবার এলো বাজারে। এসে বামুনকে এক-হাজার টাকা দাম দিলে—দিয়ে বামুনের হাঁড়ি নিয়ে রাজপুরীতে ফিরলো—রাজা বললেন—ভাণ্ডারীকে হাঁড়ি দাও—ভাণ্ডারে যেমন সব জিনিষ জমা থাকে, তেমনি এ হাঁড়ি জমা থাকবে।

এরপর একদিন যায়—দুদিন যায়—তিনদিনের দিন, তখন অনেক রাত—পুরী নিঝুম নিস্তব্ধ—সকলে ঘুমোচ্ছে—রাজার কিছুতে আর ঘুম হয় না। মাথা দপদপ করছে—

বিছানা ছেড়ে রাজা এলেন ঘরের বাহিরে যে বড় বারান্দা, সেই বারান্দায়। আকাশে এক-ফালি চাঁদ....চাঁদের জ্যোৎস্না পড়েছে চারিদিকে—সে জ্যোৎস্নায় রাজা দেখেন—পুরী থেকে একটি মেয়ে—পরণে ঝক্‌ঝক্ জড়ির শাড়ী—গায়ে গহনা, মুখে মস্ত ঘোমটা—মেয়েটি পা টিপে টিপে চলেছে পুরীর দেউড়ীর দিকে! কে? কে ঐ মেয়ে? রাজা বেশ চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে? কে তুমি? মেয়েটি সাড়া দিলে না—ফিরেও তাকালো না—যেমন যাচ্ছিল তেমনি চলেছে।

রাজা তখন প্রায় ছুটে নীচে নেমে এলেন....মেয়েটি তখন দেউড়ির সামনে—রাজা এসে বললেন—কে তুমি?

মেয়েটি দাঁড়ালো....বললে—আমি এ পুরীর লক্ষ্মী! রাজা বললেন—এত রাত্রে পুরী ত্যাগ করে কোথায় চলেছেন মা লক্ষ্মী?

মা-লক্ষ্মী বললেন—পুরীতে আর কি করে থাকি বলো? তুমি

কার দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনে পুরীতে এনেছো—যেখানে দুঃখ-দুর্দ্দশা সেখানে আমি থাকি না—থাকতে পারি না তো।

রাজা বললেন—কিন্তু আমি সত্য রক্ষা করেছি, মা লক্ষ্মী। কথা দিয়েছি, বাজারে যারা জিনিষ বিক্রী করতে আসবে, তাদের সে জিনিস যা বিক্রী হবে না আমি সে জিনিস দাম দিয়ে কিনবো—তা যে জিনিসই হোক। কাজেই আমি বামুনের দুঃখ দুর্দ্দশা কিনে সে কথা রক্ষা করেছি,—ও জিনিষ না কিনলে আমার সত্যভঙ্গের পাপ হতো। এ জিনিষ কিনে আমি কোনে পাপ করিনি যখন—তখন আপনি কি বলে আমার পুরী ত্যাগ করে যাবেন ?

আমি এ পুরী ত্যাগ করে যাব না।

মা-লক্ষ্মী বললেন—তবু যেতে হবে, মহারাজ। কেন না দুঃখ-দুর্দ্দশার সঙ্গে লক্ষ্মী এক পুরীতে কখনো থাকে না। কাজেই আমায় যেতে হবে মহারাজ।

রাজা বললেন—বিনা-পাপেও আমাকে যদি ত্যাগ করে যান—কি করবো, উপায় নেই। তা বলে সত্যভঙ্গ করবো না আমি।

মা-লক্ষ্মী চলে গেলেন। রাজা শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, মা-লক্ষ্মীকে আর কোন কথা তিনি বললেন না।

পরের দিন রাত্রেও রাজার ঘুম হচ্ছে না···রাজা এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। দাঁড়াতেই দেখেন, সুন্দর সুপুরুষ এক ব্রাহ্মণ পুরী থেকে চলছেন দেউড়ির দিকে! রাজা নেমে এসে তাঁকে বললেন—আপনি কে?

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি হলুম ধর্ম্ম।

রাজা বললেন—এত রাত্রে পুরী ত্যাগ করে কোথায় চলছেন।

ধর্ম্ম বললেন—এ পুরী আমি ত্যাগ করে যাচ্ছি। লক্ষ্মী যে জায়গা ছেড়ে যান—আমিও সেই জায়গায় থাকি না। লক্ষ্মী যেখানে গেছেন, আমিও সেই জায়গায় যাচ্ছি।

রাজা বললেন—কিন্তু আমার অপরাধ? আমি পাপ করিনি, অধর্ম্ম করিনি, আপনি কি বলে ত্যাগ করে যাবেন?

ধর্ম্ম চট্ করে একথার জবাব দিতে পারলেন না—ভাবতে লাগলেন।

রাজা বললেন—বুঝেছি, আমি ঐ বামুনের দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনে পুরীতে এনেছি, তাই আপনি চলে যাচ্ছেন। কিন্তু ও দুঃখ-দুর্দ্দশা কিনে আমি সত্যরক্ষা করেছি—আপনারই মান রেখেছি। আমি যদি না কিনতুম, তাহলে আপনার অপমান করতুম—আমার অধর্ম্ম হতো। এর জন্য আপনি আমাকে কিছুতেই ত্যাগ করে যেতে পারেন না—যদি যান, আপনি তাহলে ধর্ম্ম হয়ে অধর্ম্ম করবেন!

ধর্ম্ম বললেন—রাজা ঠিক বলেছেন! তিনি খুসী হলেন, বললেন—তুমি ঠিক কথা বলেছো, মহারাজ—আমি এ পুরী ত্যাগ করে গেলে আমার মহা-অধর্ম্ম হতো। ত্রিভুবনে কেউ তাহলে আর ধর্ম্মকে মানতো না। তুমি আমাকে খুব রক্ষা করেছো। আমি এ পুরী ত্যাগ করে যাবো না।

এ-কথা বলে ধর্ম্ম দেউড়ি থেকে ফিরে পুরীতে ঢুকলেন, রাজা চুপ

করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে পুরীতে ফিরবেন হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনলেন। ফিরে তিনি দেখেন, মা-লক্ষ্মী পুরীর দেউড়িতে।

রাজা বললেন—মা-লক্ষ্মী! আপনি ফিরে এলেন।

মা-লক্ষ্মী বললেন—হ্যাঁ মহারাজ। আমাকে ফিরতে হলো, কেন না, ধর্ম্ম যেখানে থাকেন, সেখানে আমাকে থাকতে হবে। ধর্ম্মকে যে মানে, সে কখনো লক্ষ্মীছাড়া হতে পারে না। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই লক্ষ্মী! আমার ভুল হয়েছিল মহারাজ, তাই চলে গিয়েছিলুম। পরের দুঃখ-দুর্দ্দশার ভার যে নিতে পারে তার মতো ধার্ম্মিক আর কেউ নেই। তুমি যতদিন ধর্ম্মকে এমনি মেনে চলবে—তোমার পুরী থেকে আমার যাওয়ার সাধ্য থাকবে না—কখনো আমি এ পুরী ত্যাগ করে যেতে পারবো না।

এর পর থেকে রাজার সুখ আর ঐশ্বর্য্য দিনে দিনে বাড়তে লাগলো—রাজার পুণ্যধর্ম্মে রাজ্যে প্রজাদেরও আর কোন দুঃখ-দুর্দ্দশা রইলো না।
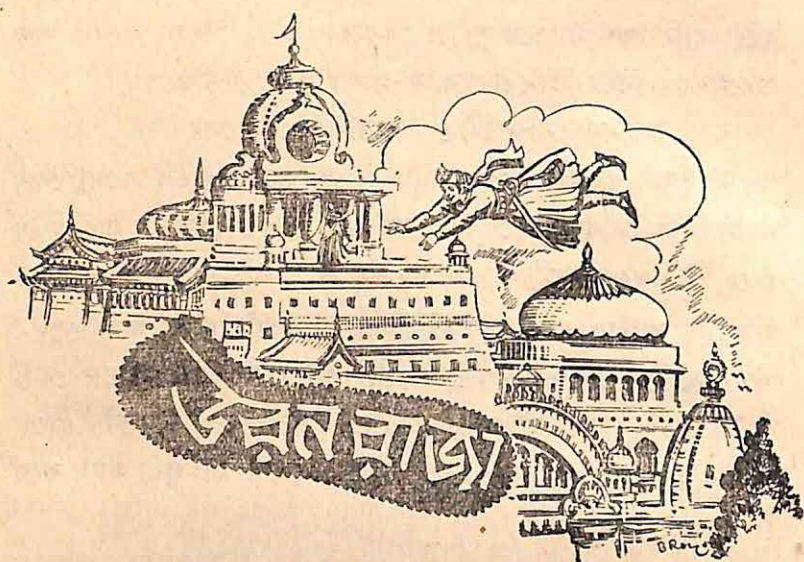
এক রাজা····রাজা ভারী খেয়ালী! মাঝে মাঝে তাঁর এমন খেয়াল জাগে যে সে-খেয়ালের রাজ্যে ওলোট-পালোট ঘটে! একবারের কথা বলি।

সেদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রাজা এলেন দোতলার খাবার ঘরে—এ ঘরে সকালে রাজা-রাণী বসে চা, জলখাবার খান। তারপর সাজগোজ করে তিনি নামেন সভায় রাজকার্য্য করতে। রাজা ঘরে এলেন—তাঁর মুখ খুব গম্ভীর। রাণী দু-পেয়ালায় চা ঢাললেন—সামনের টেবিলে দুখানি প্লেটে সাজানো জলখাবার—খাজা-গজা-সন্দেশ-রাজভোগ-নিমকা আর আপেল-নাশপাতি! রাণী খেতে লাগলেন, রাজা কিছু খান না। খোলা জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে—রাজা সেই আকাশের দিকে চেয়ে আছেন!

রাণী বললেন,—চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল! না খেয়ে কি এত ভাবছো এই সকালে! কোথাও যুদ্ধ-টুদ্ধ বাধলো নাকি?

নিশ্বাস ফেলে রাজা বললেন,—না, যুদ্ধ নয়। কাল রাত থেকে একটা কথা ভাবছি—তার জন্য রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি।

—কিসের ভাবনা ?....রাণী করলেন প্রশ্ন।

রাজা বললেন,—ভাবছি, যদি উড়তে পারতুম,—কি ভালোই না হতো!

রাণী হাসলেন, বললেন,—কেন ? হঠাৎ ওড়বার সাধ কেন ?

রাজা বললেন,—তাতে কত সুবিধা, জানো ? এক নম্বর সুবিধে—দূরে কোথাও যেতে চাই—গাড়ী তৈরী করতে বলবো—গাড়ী তৈরী হয়ে ফটকে আসবে, তারপর সেই গাড়ীতে বসে যাওয়া.... উড়তে পারলে যেমন যাবার কথা মনে হওয়া—ব্যস্—হুশ্ করে উড়ে চললুম! দু-নম্বর সুবিধা—গাড়ীতে যেতে সময় লাগে বেশী—উড়ে গেলে চটপট যাওয়া যায়! তিন নম্বর সুবিধা—জলাজঙ্গল, নদীপাহাড় ....উড়ে উড়ে দিব্যি টোপকে পার হওয়া যায়—গাড়ীতে তা হয় না! চার নম্বর সুবিধা—গলিঘুঁজি, ঘোরা পথ ধরে চলতে হয় না—সেখানে যেতে চাও, সোজা উড়ে যাও! পাঁচ নম্বর সুবিধা—যুদ্ধ-টুদ্ধ হলে শত্রু কোথায়, কত দূরে—আকাশে উড়ে চট্ করে তা দেখা যায়। ছ-নম্বর সুবিধে—মজা....উড়ো পথে পৃথিবীকে কি মজারই না দেখা যাবে!

রাণী হা-হা করে হেসে উঠলেন—বললেন,—ডানা নেই, উড়বে কি করে ? জলে হাত-পা মেলে সাঁতার কাটো বলে—আকাশে তা করা যাবে না তো! এখন ও-চিন্তা রেখে খাও....বেলা নটা বাজে—সভায় যাবার সময় হলো।

রাজা বললেন,—থাক সভা—থাক চা, জলখাবার! আমি চললুম আমার চিন্তা-কক্ষে....চিন্তা করে উপায় ঠিক করতেই হবে—না হলে শান্তি পাবো না।

রাজা উঠে চিন্তাঘরে ঢুকলেন—ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন—কেউ না বিরক্ত করে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে দেয়। একঘণ্টা পরে রাজা বেরুলেন—তাঁর হাতে বড় একখানা রোল-করা কাগজ।

রাণী বললেন, ও কাগজ কিসের ?

রাজা বললেন,—উপায় স্থির করার ব্যবস্থা। এটা হলো ঘোষণা-পত্র....এই পড়ে ঢ্যাঁড়াদার রাজ্যময় ঘোষণা জানাবে।

রাণী বললেন,—কি ঘোষণা—শুনি!

রাজা পড়লেন কাগজ দেখে ঘোষণা ঃ

রাজাকে প্রণাম করে বুড়ী বললে...

সর্ব্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হইতেছে,—আমার জানা বা জানা নাই, তবু আমি উড়িতে চাই। যে নাকি আমাকে উড়িতে শিখাইবে, তাহাকে পুরস্কার দিব—সে ব্যক্তি যে-পুরস্কার চাহিবে, সেই পুরস্কার! অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সংবাদ জানাও। ইতি....

পরের দিন সকালে রাজা সাজঘরে সাজপোযাক পরছেন—রক্ষী

জানালো—এক বুড়ী এসেছে মহারাজ—সে দর্শন করতে চায়....সে শেখাবে আপনাকে উড়তে !

রাজা মহাখুশী ...বললেন,—বটে-বটে-বটে ! তার জন্য অবারিত দ্বার—তাকে এখনি এ ঘরে নিয়ে এসো—একতিল দেরী নয় !

তাই হবে মহারাজ !....বলে রক্ষী চলে গেলো ।

রাজার আর পোষাক পরা হলো না....দামী রেশমের চুড়িদার পাজামাটি পরেছেন....গায়ে মলমলের একটা শার্ট....কোমরে কোমরবন্ধে আঁটা মস্ত তলোয়ার....শার্টের উপর চাপাবেন জরি চুমকীদার ভেল-ভেটের আচকান....তা আর পরা হলো না—পায়ের জরির জুতাটা বদলাবেন, তা হলো না....মাথার তাজ পড়ে আছে টেবিলে....বুড়ী এলো ঘরে ।

রাজাকে প্রণাম করে বুড়ী বললে,—আপনার ঘোষণা জেনে এসেছি মহারাজ....আমি আপনাকে উড়তে শেখাবো । আপনি আমাকে তার জন্য পুরস্কার দেবেন তো ?

রাজা বললেন,—নিশ্চয় ! ঘোষণা যদি শুনে থাকো, তা'হলে নিশ্চয় শুনেছো—আমাকে উড়তে শেখালে যে পুরস্কার তুমি চাইবে, পাবে !

বুড়ী বললে,—দেখবেন মহারাজ—আপনি বড়লোক—রাজা-মহারাজা মানুষ—আমি গরীব বুড়ী—কাজ হাসিল হলে বড়লোকেরা কথার খেলাপ করে—গরীবের কথা ভুলে যান !

মাথায় তাজ পরতে পরতে রাজা বললেন,—না-না-না—আমাকে তেমন মানুষ পাওনি ! আমি সত্যিকারের রাজা—মুখে যা বলি, কাজে তা করি । আমার কথার খেলাপ হয় না কখনো !

—বেশ !....বুড়ী বললে,—তা'হলে মনে রাখবেন....আমি শেখাচ্ছি ওড়া-বিদ্যা !

এ কথা বলে বুড়ী দড়ির ফালা বাঁধা একটা ছড়ি বার করলো.... ছড়ির কাঠিতে হাত দিয়ে কি মন্ত্র পড়লো—তারপর সে ছড়ি ঠেকালো

রাজার গায়ে। রাজার গায়ে যেমন ছড়ির ছোঁয়া লাগলো, অমনি কার্পেট-পাতা মেঝে ছেড়ে রাজা উঠলেন উঁচুতে !

বুড়ী বললেন,—উড়তে শিখলেন মহারাজ—খোশমেজাজে উড়ুন। এখন আমার পুরস্কার !

রাজা মহাখুশী....বললেন,—বলো, কি চাও ?....

বুড়ী বললে,—আমার ভাইপো আছে—নীল-পাহাড়ের রাক্ষস-রাজা আমার ভাই....তার ছেলে আমার ভাইপো। সেই ভাইপোর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিন।

শুনে রাজা বললেন,—এ কি অন্যায়! মানুষের কন্যার সঙ্গে রাক্ষসের ছেলের বিবাহ! তা কখনো হতে পারে....না-না-না !....

বুড়ী বললে,—না হয়—হবে না। আমি তা'হলে চললুম। বলেছিলুম তো মহারাজ—বড়লোকেরা কথার খেলাপ করতে ওস্তাদ। আপনি বিদ্যা শিখেছেন—এখন উড়ুন মনের সুখে—তারপর আফশোষ করতে হবে—এই ওড়ার জন্য !

এ কথা বলে রাজার গায়ে তিনবার ফুঁ দিয়ে বুড়ী চকিতে হলো অদৃশ্য।

বুড়ী তো চলে গেল—কিন্তু রাজার হলো মুস্কিল। বেলা নটা বাজে...সভায় যেতে হবে....তিনি এখনো জামা গায়ে দেননি....জামা গায়ে দেবেন—কিন্তু কিছুতেই মেঝেয় দাঁড়াতে পারেন না! মেঝেয় নামেন—উড়তে উড়তে নামেন—কিন্তু দাঁড়াতে পারেন না....নামবামাত্র আবার উড়ে উপরে ওঠা! দাঁড়াবার যত চেষ্টা করেন—পারেন না। গলদ্‌ঘর্ম্ম ব্যাপার !

শেষে উড়তে উড়তে দেয়ালে মাথা ঠুকলো—তারপর প্রকাণ্ড খোলা জানলার ভিতর দিয়ে উড়তে উড়তে তিনি এলেন পুরীর বাহিরে।

বাহিরে এসে ওড়া—নীচের দিকে চেয়ে দেখেন—মন্ত্রী, সভাসদরা আসছেন পুরীতে—সভায় রাজকার্য্য হবে তার জন্য। রাজা চীৎকার করে ডাকলেন, মন্ত্রী....মন্ত্রী....

মন্ত্রী উপর দিকে চাইলেন—সভাসদরা চাইলেন উপর দিকে···· সকলে দেখেন—রাজা আকাশ-পথে। তাঁরা অবাক····ভাবলেন—স্বপ্ন দেখছেন না কি! বেলুন নয়····তারের রিং ধরা নয়····রাজা আকাশপথে!

মন্ত্রী বললেন,—ব্যাপার কি মহারাজ?

রাজা বললেন,—উড়ছি····আমি উড়ছি····কিছুতেই মাটিতে নেমে থিতু হতে পারছি না!

মন্ত্রী বললেন,—নামুন····আমরা ধরে থিতু করবো।

রাজা নামলেন····কিন্তু মন্ত্রীরা ধরবেন কি—নেমেই রাজা উঠলেন আকাশ পথে।

রাজা বললেন,—তোমরা সভায় গিয়ে রাজকার্য্য করো····আমার আজ সভায় যাওয়া হবে না দেখছি।

রাজা উড়তে লাগলেন····উড়ছেন—কোমরবন্ধে বাঁধা খাপসমেত রাজার মস্ত তলোয়ার! উড়তে উড়তে তিনি এলেন সাততলায় রাণীর যে-ঘর সেই ঘরের বাইরে। রাণী তখন স্নান সেরে বড় আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছেন—হঠাৎ জানলায় কালো ছায়া পড়লো। রাণী ভাবলেন—মেঘ করলো বুঝি····কিন্তু চেয়ে দেখেন, মেঘ নয়—রাজা! তিনি চমকে উঠলেন!

রাণী বললেন,—ও কি, ওখানে গেলেন কি করে মহারাজ! এ কি খেয়াল···· কার্নিশ বয়ে ঘুরছিলেন বুঝি! ছি-ছি, এ কি বুদ্ধি···· এখনি পড়ে যাবেন যে····পড়লে দেহখানা আস্ত থাকবে না যে!

রাজা বললেন,—খেয়াল নয় রাণী, খেয়াল নয়। আপদ! না বললে তুমি বুঝবে না।

এ কথা বলে প্রকাণ্ড খোলা জানলা দিয়ে উড়তে উড়তে রাজা ঢুকলেন এ ঘরের মধ্যে। রাণী তো অবাক! ভয় হলো—ভূতে পেলো নাকি মহারাজকে! তা যদি পেয়ে থাকে, তা'হলে রাজা, রাণী, রাজ্য····কিচ্ছু থাকবে না তো!

ভয়ে ভয়ে রাণী বললেন,—কি করে এমন আপদ····

রাণীর কথা শেষ হলো না। রাজা বললেন, দেখছো না! ভূঁয়ে আমার পা নেই—হাঁটছি না····আমি উড়ছি। সকাল থেকে সেই যে ওড়া সুরু হয়েছে, এর বিরাম নেই। ওড়া কি করে থামবে, তা জানি না।

রাণীর ভারী মজা লাগলো। রাজার দুঃখ তিনি বুঝলেন না—হো-হো করে হেসে উঠলেন।

রাণীর সে হাসি দেখে রাজার হলো রাগ। এমন রাগ যে ভালো থাকলে এখনি গর্দ্দানা নিতেন। কিন্তু দাঁড়াতে পারছেন না, বসতে পারছেন না—খালি ওড়া আর খালি ওড়া! কাজেই রাগের চোটে তিনি উড়তে উড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—বেরিয়ে গিয়ে পুরীর চূড়ার চারিদিকে ঘুরতে লাগলেন।

রাণী, মন্ত্রী, সভাসদ····সকলে শুনলেন, বাইরে হৈ-হৈ রব····সকলে তাঁরা এলেন বাহিরে—এসে দেখেন, রাজা পুরীর চূড়ার চারিদিকে ঘুর-ঘুর করে উড়ছেন আর উড়ছেন····রাজ্যের যত প্রজা নীচে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রাজার ওড়া দেখছে।

রাজ্যশুদ্ধ সকলে অবাক! রাজার এ হলো কি! ডানা নেই—তবু উড়ছেন! খেয়ালেও হতে পারে না, খেয়াল হলেই বা বিনা ডানায় রাজা উড়বেন কি করে! যত প্রতাপ তাঁর থাকুক—জলে-স্থলে সে প্রতাপ জাহির করা চলে—কিন্তু আকাশে?

সকলের গা ছম্‌ছম্‌ করছে—কোনো ভূতুড়ে ব্যামো! না হয় ভূতে পাওয়া! তা যদি হয়····

রাণী, মন্ত্রী, সভাসদ—সকলে রাজার দিকে চেয়ে চ্যাচাতে লাগলেন,—নেমে আসুন মহারাজ—নেমে আসুন।

উড়তে উড়তেই রাজা বললেন,—বলচো তো নেমে যেতে, কিন্তু তারপর? দাঁড়াতে পারছি না, বসতে পারছি না····শুধু ওড়া!

রাণী বললেন,—ঐ লোহার শিকটা ধরুন মহারাজ....বজ্র-ধারণ যে-শিকটা খাড়া উঁচু হয়ে আছে, সেটা ধরলে ওড়া বন্ধ হতে পারে। তারপর আমরা দেখছি, কি উপায় হতে পারে।....

রাজা তখন দু হাতে শিকটা ধরলেন আঁকড়ে—কিন্তু শিক আঁকড়ে কি হবে—রাজার ওড়া থামে না....সেই শিক ধরে হাত-পা মেলে তিনি উড়তে লাগলেন,—কোমরে কোমরবন্ধে আঁটা তলোয়ার ঝুলছে—সে তলোয়ারের খোঁচা লাগছে গায়ে।

রাণী বললেন চেঁচিয়ে,—দাঁড়াও—পা দুটো নীচের দিকে নামিয়ে দাও....কার্নিশ আছে—সেই কার্নিশে দাঁড়াও।

রাজার গলদ্‌ঘর্ম্ম দশা। তাঁর মেজাজও বেশ তিরিক্ষি হয়েছে—এমন মেজাজ যে একবার সভায় সিংহাসনে বসতে পারলে বুঝি, রাণী, মন্ত্রী, সভাসদ, সেনাপতি, কোটাল সকলের গর্দানা নেন! এমন সব অপদার্থ—এ বিপদে কোনো উপায় বাতলাতে পারছে না।

রাজা খিঁচিয়ে জবাব দিলেন,—পা নামিয়ে দাঁড়াবো। এই নিজের এমন হলে বুঝতে, দাঁড়ান অসম্ভব। পা কিছুতেই নুইবে না—তা পা নামাবো কি!....এমন ঘোরার চেয়ে মরণ ভালো।

মন্ত্রী বললেন,—পা দিয়েও শিক আঁকড়ে ধরুন মহারাজ! তা'হলে ওড়া বন্ধ হবে।

—থামো....থামো....সকলের বিদ্যা-বুদ্ধি জানা গেছে। এইসামান্য ব্যাপারে কিচ্ছু করতে পারো না, আর এত বড় রাজ্যে মন্ত্রিত্ব করছো!

রাজা পা দিয়ে শিক আঁকড়াবার উদ্যোগ করলেন, কিন্তু পা কিছুতেই বেঁকবে না, নুইবে না....চিতিয়ে আছে। পা দুখানা যেন তাঁর নিজের নয়—এমন অবস্থা!

রাজা শিক ছেড়ে দিলেন—ওড়ার বিরাম ঘটে না। উড়তে উড়তে তিনি নাচের দিকে এলেন—বললেন,—বড় সতরঞ্চি কিংবা কার্পেট এনে তাই চাপিয়ে দাও আমার গায়ে—যেমন করে শিকারীরা পাখী ধরে....বুঝলে?

তাই হলো। রাজার সভাগৃহের প্রকাণ্ড কার্পেট বয়ে নিয়ে এলো বিশ-পঁচিশজন জোয়ান রক্ষী···রাজা নীচে নাগালের মধ্যে যেমন উড়ছেন—তাঁর গায়ে জালের মতো কার্পেট চাপানো হলো। কিন্তু আশ্চর্য্য···কার্পেট চাপাবামাত্র সেই কার্পেট শুদ্ধ রাজা উড়তে উড়তে উঁচুতে উঠলেন—অনেক উঁচুতে।

রাজা ভাবলেন—এ ওড়া তাঁর মরার আগে থামবে না—উড়তে উড়তেই মৃত্যু। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে···রাণীও বুঝলেন—বেলা তিনটে বেজে গেছে রাণী বললেন,—আমি ছাদে দাঁড়াই—পাত্রে খাবার নিয়ে··· তুমি খাবে।

রাজার খাবারদাবার রাখা হলো ছাদে টেবিল পেতে···সেই টেবিলের উপর—কালিয়া, পোলাও, তরি-তরকারী, চাটনি, দই, ক্ষীর, রাবড়ী, সন্দেশ, রাজভোগ। উড়তে উড়তে রাজা এসে এক এক কামড় দেন—বসে বা দাঁড়িয়ে খাবেন সে উপায় নেই···উড়তে উড়তে ঘণ্টাখানেক ধরে খাওয়া হলো। এভাবে খেয়ে কি মানুষ আরাম পায়! কিন্তু, উপায় কি!

রাত্রি হলো···ঘুমোবেন কি করে! রক্ষীরা মশাল জ্বেলে পাহারাদারিতে মোতায়েন রইলো ঘুমের ঘোরে রাজা পড়ে গিয়ে হাত-পা না ভাঙ্গেন!

রাত্রিও কাটলো। সকালে রাজা বললেন,—ফৌজের কুচকাওয়াজ হোক···রাজকার্য্য যেমন চলে—তোমরা চালাও। আমি উড়তে উড়তে যতটা পারি দেখবো!

একদিন, দুদিন—এমনিভাবে কাটলো! প্রজারা পথে-ঘাটে আস্তানা নিলে···খাবার-দাবার এনে মাঠে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে··· মাঠে বিছানা-বালিশ এনে শুয়ে রাত্রে ঘুমোচ্ছে।

রাজা বললেন সকলকে শুনিয়ে—সেই ডাইনী-বুড়ীর কাহিনী··· সকলে করতে লাগলো সেই বুড়ীর সন্ধান!

বুড়ীকে পাওয়া গেল সাতদিন পরে—সে অন্য কোন রাজ্যে

গিয়েছিল—সে রাজার প্রার্থনায়। সে ফিরতে তাকে পাওয়া গেল···· রাজার ফৌজ তাকে ধরে আনতে গিয়েছিল, পারে নি—তখন বহু মিনতিতে বুড়ার মনে দয়া-মায়া জাগিয়ে তাকে নিয়ে আসা হলো।

বুড়ী এলো রাজপুরীর সামনে ময়দানে····রাজা উড়তে উড়তে এলেন তার কাছে—এসে বললেন,—ওড়ার সখ মিটেছে····আমাকে বাঁচাও!

বুড়ী বললে,—রাজারা কথা রাখে না—আমরা কথা রাখি।

রাজা বললেন,—তুমি যা চেয়েছিলে, তা আমি কেমন করে দেবো! তুমি বলেছিলে,—আমার কন্যার সঙ্গে দিতে হবে নীল-পাহাড়ের রাক্ষস-রাজার ছেলের বিয়ে! আমার কন্যা নেই, তা বিয়ে দেবো কি?

—ও, তাই নাকি!····বুড়ী বললে,—তা'হলে আমার মন্ত্র ফিরিয়ে নি····মহারাজ!—তুমি যেমন ছিলে আবার তেমনি হবে।

—তাই করো বুড়ামা····দয়া করে তাই করো!····রাজা বললেন।

হেসে বুড়ী বললে,—ওড়ার সাধ?····

রাজা বললেন,—কান মলছি····আর কখনো ওড়ার সাধ করবো না। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। যা নেই, যা হবার নয়—তার লোভ আর কখনও করবো না—কখনো না!

বুড়ী বললে,—বেশ····তা'হলে মন্ত্র তুলে নিলুম।

বুড়ী দিলে রাজার গায়ে তিনটি ফুঁ····সঙ্গে সঙ্গে রাজা মাটিতে পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়ালেন—আবার যেমন ছিলেন তেমনি!

রাণী নিঃশ্বাস ফেললেন—আরামের নিঃশ্বাস! মন্ত্রী, সভাসদ, প্রজারা সকলে ফেললো আরামের নিশ্বাস।

রাজা এ দায়ে রক্ষা পেলেন।

———

প্রকাণ্ড এক সাপ—দুপুরবেলা তার গর্ত্ত থেকে বেরিয়েছে বাহিরে হাওয়া খেতে। বাহিরের হাওয়া চমৎকার লাগছে····হাওয়া খেতে খেতে সে এলো রাজপুরীর মধ্যে যে ঘরে সভা বসে, সেই ঘরের দরজায়। দরজায় ছিল শান্ত্রী-পাহারা, তারা প্রকাণ্ড সাপ দেখে 'বাপ্‌স্‌' বলে ভয়ে দে দৌড়। সাপ তখন ঢুকলো সেই সভা-ঘরে।

সভায় বসে রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী, পাত্রমিত্র সভাসদের দল—রাজকার্য্য চলেছে, হঠাৎ সভাঘরে প্রকাণ্ড সাপ দেখে মন্ত্রী পাত্রমিত্রের দল ভয়ে আসন ছেড়ে যিনি যেদিকে পারেন পালালেন। রাজা, রাজপুত্র পালাতে পারেন না—পালালে ইজ্জৎ যাবে, সম্ভ্রম-মর্য্যাদা নষ্ট হবে। ভয়ে কাঁটা হয়ে তাঁরা সাপের দিকে চেয়ে বসে রইলেন—রাজার হাতে রাজদণ্ড—রাজপুত্র ফশ্‌ করে সেই দণ্ড নিয়ে সাপকে এমন জোরে মারলেন যে সাপ মরে গেল। তখন মন্ত্রী পাত্রমিত্রেরা ফিরে এসে যে-যার আসনে আবার বসলেন—রাজকার্য্য চলতে লাগল।

সেদিন রাত্রে তিন-তলায় নিজের ঘরে সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজপুত্র ঘুমোচ্ছেন—পাশে শুয়ে তাঁর বৌ ঘুমোচ্ছেন····নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি। হঠাৎ গলায় কড়াকড় শক্ত বাঁধনের চাপে দম বন্ধ হতে রাজপুত্রের ঘুম গেল ভেঙ্গে! ঘরে হাজার-ঝাড়ে বাতি জ্বলছে—চোখ

মেলে রাজপুত্র চেয়ে দেখেন, প্রকাণ্ড একটা সাপ পাক দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ফণা তুলেছে....ছোবল মারে আর কি! ভয়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন—তাঁর চীৎকারে রাজপুত্রের বৌয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে তিনি দেখেন, এই ব্যাপার! তিনিও চীকার করে উঠলেন।

তাঁদের চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে দাসীরা এবং রাজা-রাণী এলেন এ ঘরে ছুটে—এসে দেখেন, ভীষণ ব্যাপার! রাজা বললেন—শীগগির শান্ত্রী ডাকো—সাপটাকে মেরে ফেলবে!

সাপ বললে—আপনি রাজা, যখন এসেছেন, বেশ, 'বিচার করুন।

রাজা বললেন—কিসের বিচার?

সাপ বললে—আপনার রাজ্যে কেউ যদি অকারণে অপরের প্রাণ নেয়, তা'লে শাস্তিস্বরূপ তাকেও প্রাণ দিতে হবে।

রাজা বললেন—হ্যাঁ, রাজ্যের তাই আইন!

সাপ বললে—বেশ কথা—এখন শুনুন। আজ দুপুরবেলায় রাজপুত্র যে-সাপকে মেরেছেন, আমি তার বৌ....সাপিনী। রাজপুত্র আমার স্বামীকে মেরে আমাকে বিধবা করেছেন—তাই তাঁর প্রাণে আমার দাবী আছে—আমিও তাঁকে মেরে তাঁর বৌকে বিধবা করবো। বিচার করে বলুন, আমি তা করলে আমার অপরাধ হবে কি না।

রাজা দেখলেন বিপদ! একটু ভেবে তিনি বললেন—এর বিচার এখন হতে পারে না!—কাল সভায় মন্ত্রী-সভাসদরা এলে সকলে যুক্তি করে এর মীমাংসা হবে।

সাপিনী বললে—না, তা হবে না। মন্ত্রী আর সভাসদরা আপনার মাহিনা খান—আপনার ভৃত্য। তাঁদের কাছে সুবিচার পাবো না। মনিবের ছেলের প্রাণ নিয়ে বিচার!

রাজা বললেন—বেশ, তা'হলে বাহির থেকে পাঁচজন লোক ডেকে আনবো—তারা করবে বিচার!

সাপিনী বললে—বেশ! আমি কিন্তু রাজপুত্রকে ছেড়ে যাবো

না···তাঁর গলায় এমনি পাক দিয়ে জড়িয়ে থাকবো।····ছোবল দেবো না। তারপর কাল বিচারে যা হয়!

রাজা বললেন—তাই হোক!

সে রাত্রিটা রাজপুরীতে সকলের যে করে কাটলো, বলবার নয়!

পরের দিন সকালে সভা বসলো। সভায় এলেন রাজপুত্র—তাঁর গলায় পাক দিয়ে জড়িয়ে আছে সেই সাপিনী! মন্ত্রী পাত্রমিত্রেরা এলেন সভায়, রাজপুত্রের গলায় প্রকাণ্ড সাপ জড়িয়ে আছে দেখে তাঁরা ভয়ে কাঁটা।

চীৎকারে রাজপুত্রের বউ-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

রাজা বললেন সকলকে ব্যাপার, তারপর শান্ত্রীদের ডেকে হুকুম দিলেন—বাইরে থেকে পাঁচজন লোক ডেকে আনো, তারা করবে এ মামলার বিচার।

শান্ত্রীরা বেরুলো দিকে দিকে....কিন্তু একত্রে পাঁচজন লোক কোথাও পায় না! ঘুরতে ঘুরতে তারা এলো এক মাঠে। মাঠে পাঁচজন রাখাল গরু চরাতে এসে গরু ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বসে গল্প করছে, শান্ত্রীরা তাদের ধরে রাজার সভায় নিয়ে এলো।

তারা ভয়ে কাঁপছে—কী এমন অপরাধ করেছে যার জন্য রাজার সেপাই তাদের ধরে আনলে!

কাঁদতে কাঁদতে হাতজোড় করে তারা বললে রাজাকে—আমরা কোনো অপরাধ করি নি মহারাজ!

রাজা বললেন—তোমাদের ভয় নেই—অপরাধের কথা নয়! একটা মামলার তোমরা পাঁচজনে বিচার করবে—তাই তোমাদের আনা হয়েছে। আমি তোমাদের মামলার কথা খুলে বলছি।

রাজা তাদের সব কথা বললেন। তারপর তাদের বললেন—সাপিনী বলছে রাজপুত্রের প্রাণে তার দাবী আছে—সে তাকে মারতে চায়। এখন তোমরা পাচজনে বলো—সাপিনী তা করতে পারে কি না?

চারজন রাখালের ভয় হলো, রাজ্যের আইনে সাপিনী তা করতে পারে—কিন্তু সে কথা বললে সাপিনী মারবে রাজপুত্রকে কামড়ে—তারপর রাজার হুকুমে তাদের যাবে গর্দ্দানা!

রাখালদের মধে বাকী লোকটি আর চার জনের চেয়ে বয়সে বড়—তার বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি করে সে বলেলে—এর বিচার করতে হ'লে ক'টি কথা জানতে চাই মহারাজ!

রাজা বললেন—কি কথা জানতে চাও বল।

রাখাল বললে—রাজপুত্রের ক'টি ছেলেমেয়ে?

রাজা বললেন—তিনটি।

রাখাল তখন সাপিনীকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার ক'টি বাচ্ছা গো?

সাপিনা বললে—সাতটি।

মাথা নেড়ে রাখাল বললে—তা হলে এখন তুমি রাজপুত্রকে মারতে পার না বাপু। তোমাকে সবুর করতে হবে। রাজপুত্রের আগে আরও চারটি ছেলেমেয়ে হোক! মানে, রাজপুত্রেরও যখন সাতটি ছেলেমেয়ে হবে—তোমার যেমন সাতটি—তখন তুমি রাজপুত্রকে মেরে তাঁর বৌকে বিধবা করতে পারো। তার আগে নয়।

সাপিনী বললে—তাই তা'হলে হবে। আমি সবুর করবো। রাজপুত্রের আরও চারটি ছেলেমেয়ে হোক—তখন রাজামশাই আমাকে খবর পাঠাবেন, আমি এসে রাজপুত্রকে কামড়ে মারবো।

সাপিনী রাজপুত্রের গলার পাক খুলে তাকে বন্ধন-মুক্ত করে বললে—রাজামশায়ের বাগানের কোণে যে-ঝোপ আছে—সেই ঝোপে আমার গর্ত্ত। রাজামশাই সেখানে খবর পাঠাবেন।

একথা বলে সাপিনী চলে গেল। সকলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রাখালের জন্য রাজপুত্রের প্রাণ রক্ষা পেলো—রাজা তাকে দিলেন এক হাজার মোহর বখশিস্!

তারপর?

রাজপুত্রের আজও আর ছেলে-মেয়ে হয় নি। কাজেই বুছছো—তিনি নিরাপদে বেঁচে আছেন!
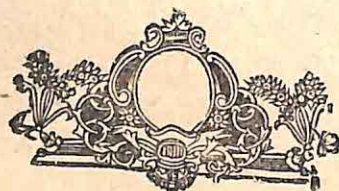
মা-বাপ আদর করে ছেলের নাম রেখেছিল—লাখপতি। ভেবেছিল, ঐ নামের জোরে ছেলে হবে লাখ টাকার মালিক। কিন্তু তা হলো না!

লাখপতির মা যখন মারা গেছে, লাখপতির বয়স তখন চার বছর, —বাপ মারা গেল লাখপতির একত্রিশ বছর বয়সে। বাপ যতদিন বেঁচেছিল লাখপতি শুধু খেয়ে শুয়ে বসে গল্প করে দিন কাটিয়েছে··· হদ্দ কুড়ে, কোনো কাজে মন নেই! বাপ মারা যাবার সময় কিন্তু টাকা রেখে গিয়েছিল—সেই টাকা ভেঙে খেয়ে দেয়ে শুয়ে বসে লাখপতি দিন কাটাতে লাগলো। ঘড়ার জল যদি ঘড়া থেকে রোজ ঢেলে ঢেলে কেউ খায়—সে-ঘড়ায় কখনো না আর ভরে, তা'হলে ঘড়ার জল কতক্ষণ থাকে! লাখপতিরও তাই হলো—বাপ মারা যাবার পর এক বছরও কাটলো না, বাপের সব টাকা লাখপতি করে দিলে ফাঁক! তারপর দারুণ অভাব! চালে খড়পাতা পড়ে না····চালে ফুটো—পেটে অন্ন জোটেনা, পরণে বস্ত্র নেই!····টাকার কথা ভেবে ভেবে লাখপতির হলো অসুখ।

অসুখ হতে মহা ভাবনা—তাই তো যদি মরে যাই !····না—না মরা হবে না ! বাঁচতেই হবে····দুশো বছর, পাঁচশো বছর বাঁচতে চায় সে।

মেঝেয় ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে শুয়ে লাখপতি ভাবছে—কেন বাঁচবে না দুশো-পাঁচশো বছর। ছেলেবেলায় রূপকথার গল্প শুনেছে—ইয়ামাতো রাজকন্যা বেঁচে ছিলেন এক হাজার বছর। তিনি যদি এক হাজার বছর বাঁচতে পারেন,—লাখপতি কেন পারবে না পাঁচশো বছর।

কিন্তু কি করে ? কি করে ঃ মনে পড়লো গল্প শুনেছে, চীনের রাজা শিন্‌-নো-শিকো····যাঁর সমান রাজা শুধু চীনে নয় পৃথিবীর কোনো রাজ্যে কখনো ছিল না····যে শিন্‌-নো-শিকো রাজা চীনের ঐ পাকা টানা পাঁচিল তৈরী করিয়েছিলেন····হাজার-হাজার শত্রুকে যুদ্ধে হারিয়েছিলেন,····চীনে কত রাজপুরী তৈরী করিয়েছিলেন····যাঁর ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ····অগাধ ঐশ্বর্য, বুড়া বয়সে অসুখ হলে মারা যাবার ভয়ে তিনি হাজার হাজার লোক পাঠিয়ে দিলেন ঃ জাপানে আছে ফুজি পাহাড়—সেই পাহাড়ে আছে অনন্ত-জীবন-জল সেই জল আনতে····

লাখপতি ঠিক করলো, ঠিক আছে····সেও যাবে সেই ফুজি পাহাড়ে অনন্ত-জীবন-জলের সন্ধানে—সেই জল খেয়ে সে হবে অমর····

রাত পোহালো····প্রভাতে আকাশে সূর্য উঠলো····সেই অসুখ-শরীরেই লাখপতি উঠলো, উঠে মুখ হাত ধুয়ে বাড়ী থেকে বেরুলো···· ফুজি পাহাড়ের উদ্দেশে অনন্ত-জীবন-জলের সন্ধানে।

চললো সে কত গ্রাম, নগর, নদী, বন, পাহাড়, জলা পার হয়ে.... চলে চলে কত দিন পরে দেখে—দূরে ঐ সেই ফুজি পাহাড়—পাহাড়ের মাথাটা আকাশের গায়ে ঠেকেছে।

পাহাড়ের দিকে চললো লাখপতি····হঠাৎ দেখা এক ব্যাধের সঙ্গে। ব্যাধকে জিজ্ঞাসা করলো,—বলতে পার ভাই,—শুনেছি ঐ পাহাড়ের ধারে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী থাকেন, তা কোথায় তাঁদের পাবো ঃ আর ঐ পাহাড়ে আছে নাকি অনন্ত-জীবন-জল ?

ব্যাধ বললে—এখানে চিরজন্ম পাখী মারছি, জন্তু জানোয়ার মারছি,

অনন্ত-জীবন-জল ফলের কথা তো কখ্খনো শুনিনি! আর সাধু-সন্ন্যাসীও কখনো চক্ষে দেখিনি—তবে যদি থাকে তো ছাখো গিয়ে ঐ পাহাড়ের ওপর!

লাখপতি বললে—ও পাহাড়ে কোন ঝর্ণা নেই?

ব্যাধ বললে—ও তুমি বুঝি সেই ঝর্ণার খোঁজে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ।

ব্যাধ বললে—অমন কাজটি করো না। ঝর্ণা কোথায়? তবে শুনতে পাই, পাহাড়ে ডাকাত আছে—মানুষজন গেলে তাকে আস্ত রাখে না!

এ কথা বলে ব্যাধ দাঁড়ালোনা—চলে গেল।

লাখপতি তার মানা শুনলোনা—চললো এগিয়ে—তারপর ফুজি পাহাড়ে উঠতে লাগলো।

পাহাড়ের মাথায় জোফুফুর মন্দির। লাখপতি গল্প শুনেছে সেই মন্দিরে সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকেন। ভাবলো, সাধুদের কাছে নিশ্চয় অনন্ত-জীবন-জলের ঝর্ণার সন্ধান পাবে।

পাহাড়ের মাথায় জোফুফুর মন্দির—কোথাও জনপ্রাণী নেই—লাখপতি উঠলো পাহাড়ের মাথায়—মন্দিরের সামনে এসে লুটিয়ে পড়ে দেবতাদের উদ্দেশে একান্ত মনে ডাকতে লাগলো—ঠাকুর-ঠাকুর। সাত দিন সাত রাত সেখানে লুটিয়ে লাখপতি ডাকলো জোফুফু ঠাকুরকে—মিনতি জানালো আকুল কণ্ঠে—দাও ঠাকুর, দাও আমার অনন্ত-অমর-জীবন—আমি বাঁচতে চাই—পাঁচশো-সাতশো বছর, এক হাজার বছর—নীরোগ দেহে।

তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—মন্দিরের দরজা হড় হড় শব্দে খুলে গেল, আর আলোর-ঝলক-লাগা এক রাশ মেঘের মধ্যে উদয় হলেন মন্দিরের দেবতা জোফুফু—

জোফুফু বললেন—যে কামনা নিয়ে তুমি এখানে এসেছো, এ যে খুব স্বার্থপরের কামনা। অমর জীবন পেতে হলে মানুষকে খুব কঠিন সাধনা করতে হয়। সে-সাধনা তুমি কখনো করেছ?

লাখপতি একথা শুনলো—কোন জবাব দিতে পারলো না। জোফুফু দেবতা বললেন—তুমি চাও, কাজকর্ম করবে না, আরামে থাকবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, ভালো থাকবে—আর পাঁচজন মানুষ যেমন কষ্টভোগ করে, কাজকর্ম করে—তুমি তা কখনো করনি, করতেও চাও না। এত সহজে কি অমর হওয়া যায়—তবু তুমি যখন কষ্ট করে এখানে আমার কাছে এসেছো—সাত দিন সাত রাত একান্ত-মনে আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছ, তোমার সে প্রার্থনা আমি অসম্পূর্ণ রাখবো না তুমি চাও অমর হতে—বেশ, যাও তুমি তা'হলে অমর-লোকে—সেখানে গিয়ে থাকো—সেখানে কারও মৃত্যু নেই।

একথা বলে লাখপতির হাতে জোফুফু দেবতা দিলেন পাতলা কাগজের তৈরী এতটুকু একটি সারস-পাখী। দিয়ে তিনি বললেন, এই সারসের পিঠে তুমি বসো—এ তোমাকে নিয়ে যাবে সেই অমর-লোকে।

কাগজের তৈরী একরত্তি সারস-পাখী দেখে লাখপতি অবাক। এর পিঠে বসা যায় নাকি ? সেটাকে নেড়েচেড়ে দেখলো—তারপর চাইলো দেবতার দিকে। কোথায় জোফুফু দেবতা ? তিনি যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছেন! মন্দিরের দরজা বন্ধ।—তখন সেই কাগজের সারসটা নামিয়ে রাখলো পাহাড়ের মাথায়—যেমন নামানো চক্ষের নিমেষে একরত্তি কাগজের তৈরী সারসের দেহ প্রকাণ্ড—প্রকাণ্ড দেহে পাখা ছাড়লো—কাগজের সারস জীয়ন্ত হয়েছে। আশ্চর্য! লাখপতি বসলো সেই সারসের পিটে। যেমন বসা, বড় বড় পাখা মেলে সারস উঠলো আকাশে—উঠেই উড়ে চললো লাখপতিকে পিঠে নিয়ে—

ভয়ে লাখপতি কাঁপছে—সারসের তার দিকে নজর নেই—সারস উড়ে চলেছে—কত পাহাড়, নদী, সাগর, বন, গ্রাম, নগরের উপর দিয়ে—উঁচুতে—আরো উঁচুতে উড়ে চলেছে।

উড়তে উড়তে দু-হাজার চার-হাজার ক্রোশ চলেছে—দিন যায়, রাত্রি আসে—রাত্রি যায় দিন আসে—উড়ে উড়ে বারো দিন বারো রাত্রি পরে সারস নামলো অনন্ত অপার সাগরের বুকে এক দ্বীপে।

সেই দ্বীপে লাখপতিকে সারস পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে আবার ছোট একরত্তি সেই কাগজের তৈরী সারস-পাখী হয়ে ঢুকলো লাখপতির জামার পকেটের মধ্যে।

লাখপতি তখন চারি দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো—এই তা'হলে সেই অমর-লোক—এখানে কেউ মরে না!

ঘুরে মাঠঘাট পার হয়ে লাখপতি এলো শহরে—শহরে মানুষের কি ভীড়! কিন্তু এখানকার মানুষজন তার দেশের মানুষজনের মত নয়। সকলে শুধু চলেছে—শুধু চলেছে—দাঁড়ায় না, বসে না—কারো সঙ্গে কেউ কথা বলে না—চেহারা যেমন জোয়ান—পোশাক তেমনি দামী আর জমকালো।

দেখে-শুনে লাখপতি ঢুকলো একটা সরাইয়ে।

সরাইওয়ালা মানুষটি ভারী ভালো ঃ লাখপতিকে দেখে বুঝলো বিদেশী মানুষ—এখানে থাকবে বলে এসেছে। সরাইওয়ালা বললে—এখানে থাকুন কোন কষ্ট হবে না। দেখে-শুনে ভালো বাড়ী খুঁজে দেবো—কায়েমীভাবে থাকবেন।

সরাইওয়ালা বাড়ী যোগার করে দিলে—লাখপতি সেই বাড়ীতে রইলো—তারপর এখানকার লোকজনদের সঙ্গে হলো আলাপ-পরিচয়।

এদেশে ডাক্তার নেই, বদ্যি নেই, শ্মশান নেই—মৃত্যু কি এখানকার লোকজন জানে না। ভারতবর্ষ আর চীন থেকে কত সাধু-সন্ন্যাসী প্রায় এখানে আসেন—তাঁদের মুখে এরা শুনেছে, স্বর্গ বলে একটা জায়গা আছে—সে জায়গায় যেমন সুখ- যেমন শান্তি, তেমন নাকি আর কোন মুল্লুকে নেই! তাঁরা বলেন—না-ম'লে কোন মানুষ সে স্বর্গে যেতে পারে না। কাজেই এখানকার কোন মানুস যে স্বর্গে যাবে, সে আশা মোটে নেই! তাই এখানকার মানুষরা আকুল—যদি মৃত্যু হতো তা'হলে স্বর্গে যেতে পারতো—শান্তি আর সুখের আশায়। অমর জীবন নিয়ে এরা আর পারে না—অসহ্য বোধ হয়—একটানা এমন বেঁচে থাকা—এর চেয়ে কষ্ট আর নেই।

এ কথা শুনে লাখপতি অবাক! যে মৃত্যুকে সে আর তার দেশের লোক ভয় করে....এরা সেই মৃত্যুকে কামনা করছে। ওরা বলে বেঁচে দিগদারী ধরে গিয়েছে....পাগল হবার চেয়ে সকলেই চায় মরতে।

লাখপতি ভাবে ঃ এমন উল্টো বুদ্ধিও মানুষের হয়! যে-বিষের একটু টুকরো খেলে মানুষ মরে যায়....যে বিষকে মানুষ ভয়ে ত্যাগ করে....এরা চায় সেই বিষ মরবার জন্য! বিদেশী কেউ এদেশে এলে এরা আগে তার কাছে খোঁজ নেয়....বিষ আছে সঙ্গে? যত দাম চাও...দেবো....বিষ দাও! কিন্তু বিষ কেউ আনে না! এতটুকু বিষের জন্য এরা সর্বস্ব দিতে পারে। এখানে যার লাখ-লাখ টাকা.... ক্রোর-ক্রোর টাকা... তারা বলে কেউ যদি আমার কাঁচা চুল পাকা করে দিতে পারে তা'হলে তার জন্য সে যদি লাখ টাকা, ক্রোর টাকা চায়....দেবে। অসুখ কাকে বলে কেউ জানে না....অসুখ কিনবে বলে তারা কতো মানুষের হাতে-পায়ে ধরেছে....কতো ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করেছে....কিন্তু রোগ কারো হয় না। হাঁচি-কাশি যে কি, তা কেউ জানে না।

দেখে শুনে লাখপতি খুব খুশী। বেঁচে বেঁচে এখানকার মানুষজনের বাঁচায় যত অরুচি ধরুক, তার কখনো বাঁচতে অরুচি ধরবে না। সে চার পাঁচশো বছর....এক হাজার বছর বাঁচবে।

লাখপতি এখানে ব্যবসা ফেঁদে বসলো। ব্যবসায় খুব লাভ হতে লাগলো। পঞ্চাশ বছর, একশো বছর, ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা হলো—তারপর হঠাৎ কি হলো, এটা করতে ওটা হয় না—এটা ধরতে সেটা যায় ফোশকে—এমনি করে লোকসানের দায়ে একদিন শেষে ব্যবসা হলো নষ্ট।

লোকজনের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ হতেই লাগলো—মনে দারুণ বিরক্তি। বহু সময় কেটে যাচ্ছে....এক মিনিট বিশ্রাম নেই, সব সময় দারুণ ব্যস্ত!

এমনি করে তিনশো বছর কাটলো। কিন্তু সেই একই ধারা....

এক কাজ····এক কথা····কোনো বৈচিত্র্য নেই····ভারী একঘেয়ে লাগতে লাগলো। এখন মনে জাগে নিজের সেই দেশের কথা—দুঃখকষ্ট থাকলেও····রোজ এমন এক ধরণে দিন কাটতো না।

মন অস্থির হয়····লাখপতি ভাবে, এদেশ থেকে পালাতে পারলে একটু নতুন রকম কিছু হোত····এমন একঘেয়েমি ভালো লাগলো না আর! ব্যাকুল হয়ে সে ভাবে—ঠাকুর····ঠাকুর····দয়া করো····এ অমর-লোক থেকে আমাকে নিয়ে যাও ঠাকুর····আমার নিজের দেশে, যেখানে জীব আছে, মরণ আছে, আমি মরতে চাই সেখানে গিয়ে।

তার এ-ডাকে ফুজি পাহাড়ের জোফুফু দেবতার মন টললো। সেখান থেকে তিনি ইশারা করলেন সেই কাগজের তৈরী একরত্তি সারসকে। সে ইশারা পেয়ে সারস-পাখী বেরিয়ে এলো লাখপতির জামার পকেট থেকে—এসে লাখপতির সামনে প্রকাণ্ড জীয়ন্ত মূর্তি নিয়ে দাঁড়ালো। লাখপতি মহা খুশী····ঠাকুর তার প্রার্থনা শুনেছেন, সে বসলো সারসের পিঠে চেপে—তাকে নিয়ে সারস উঠলো আকাশে—উঠে এবারে লাখপতির দেশের দিকে ফেরা।

সারস চলেছে উড়ে····তার পিঠে বসে লাখপতি বার বার ফিরে তাকাচ্ছে অমর-লোকের পানে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবে তাই তো, আবার সেই মরণের দেশে চলেছি মৃত্যুহীন দেশ ছেড়ে এসে!····

মনটা একবার হায় হায় করে উঠলো····সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো····না, ওখানে আর নয়—বেঁচে থেকে থেকে বিশ্রী একঘেয়ে মনে লাগছিল। নিত্য সেই এক ধারা····এখন মরণকে দেখতে হবে। স্বর্গে যাবো····স্বর্গে কত সুখ····কত শান্তি!

হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ ঢেকে ঝড় উঠলো····দারুণ ঝড়····সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো····যেমন বিদ্যুতের চমক, তেমনি বাজের গর্জন! বৃষ্টির জলে কাগজের সারস ভিজে চুপ্‌সে একশা—তার পাখা দু'খানা ন্যাতা হয়ে দুমড়ে গায়ে লেপটে গেল—উড়তে পারে না! সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে সারস পড়লো ঢেউ-ওঠা সাগরের জলে লাখপতিকে

পিঠে নিয়ে....লাখপতি চীৎকার করে উঠলো—মরে গেলুম....মরে গেলুম....ওগো বাঁচাও....বাঁচাও রক্ষা করো, ঠাকুর।

ঢেউয়ে চুবন খেতে খেতে মাথা তুলে তাকায় লাখপতি···জলের বুকে না একখানা নৌকা, না ডিঙ্গি একটা কুটো পর্যন্ত দেখতে পায় না।

ডুবছে, ভাসছে, নাকে-মুখে-চোখে নোনাজল ঢুকছে, লাখপতি প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে....আর ঠাকুরকে ডাকছে—বাঁচাও বাঁচাও ঠাকুর।

হঠাৎ দেখে, সামনে বিরাট একটা হাঙর—কি প্রকাণ্ড তার হাঁ—যেন পৃথিবীটাকে ও-হাঁয়ে গিলতে পারে। হাঁ-করে হাঙরটা আসছে তার দিকে তেড়ে....তীরের বেগে···

হঠাৎ দেখে সামনে বিরাট এক হাঙ্গর

আর রক্ষা নেই....লাখপতি চোখ বুজলো।···চোখ বুজে একান্ত মনে ডাকছে—বাঁচাও—বাঁচাও জোফুফু ঠাকুর।

তারপর সে অজ্ঞান হলো....

জ্ঞান হতে চোখ মেলে লাখপতি চেয়ে দেখে—কোথায় সে হাঙর... কোথায় বা তালগাছের মতো উঁচু ঢেউয়ে-দোলা সুমুদ্দুর—কোথায় সে ঝড়-জল—সে পড়ে আছে ফুজি পাহাড়ের মাথায় সেই জোফুফু-দেবতার মন্দিরের সামনে....সর্বাঙ্গ তার ঘামে ভিজে শপশপ করছে! ভাবলো, এতক্ষণ তা'হলে স্বপ্ন দেখছিলুম নাকি?

লাখপতি উঠে বসলো—সঙ্গে সঙ্গে সারা আকাশে রাঙা করে ফুটলো জ্বল্‌জ্বলে জ্যোতি—সেই জ্যোতির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন সাধু—সাধুর হাতে একখানা পুঁথি। পুঁথিখানা লাখপতির হাতে দিয়ে মূর্তি বললেন—জোফুফু দেবতা আমাকে পাঠিয়েছেন; তোমার প্রার্থনা তিনি শুনেছেন। শুনে তোমার প্রার্থনা মতো স্বপ্নে তোমাকে অমর-লোকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও তো তুমি খুশি হতে পারনি বাপু—মনে শান্তি ছিল না—আবার মৃত্যু-ভরা দুনিয়ায় আসতে চেয়েছিলে মরবে বলে। মরতে চেয়েছিলে ব'লে দেবতা তোমাকে স্বপ্নে সাগরের জলে ফেলেছিলেন—হাঙর পাঠিয়েছিলেন তোমাকে মৃত্যু দেবেন বলে—কিন্তু তখন আবার তুমি ঠাকুরকে ডেকে প্রার্থনা জানিয়েছিলে তোমাকে যেন তিনি বাঁচান! কাজেই দেবতা বলেছেন, তোমার বাঁচার কামনা যেমন মিথ্যা, মরার কামনাও তেমনি মিথ্যা! এখন বাড়ী ফিরে যাও—বাড়ী গিয়ে কুড়ের মত শুয়ে-বসে দিন কাটিয়ো না—কাজকর্ম করবে—পাঁচজনে যেমন করে। বিয়ে করে স্ত্রীপুত্র পালন করবে, পাড়া-পড়শীর সঙ্গে মেলামেশা করবে, তাদের ভালো-বাসবে—কারো অনিষ্ট করবে না। মানুষের অনেক কর্তব্য আছে—সেই সব কর্তব্য যদি করো, সুখী হবে, শান্তি পাবে—জীবনে কোনদিন অরুচি বা বিরাগ হবে না। আর যে পুঁথি দিলুম—এখানি পড়বে, পুথিতে লেখা আছে, জীবনে মানুষের কি কর্তব্য—কি করলে জীবন হবে সুখের। এ-কথা বলে সাধুর মূর্তি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

লাখপতি বাড়ী ফিরলো—বাড়ী ফিরে কাজে-কর্মে মন দিলে, বিয়ে-থা করলে—ছেলে-মেয়ে হলো—তাদের নিয়ে সুখে সংসার করতে লাগলো। দেখলো, জীবনটা সত্যই সুখের—অভাব যতই ঘটুক তবু পাচজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকায় শান্তি মেলে।

রাজার বউ দেখা
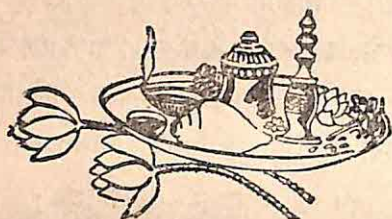
এক রাজা—রাজার যেমন রূপ, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধি, আবার তেমনি প্রতাপ। রাজা বিবাহ করবেন—নিজে পাত্রী দেখছেন—কত রাজার কন্যা, মন্ত্রীর কন্যা—কিন্তু কোন কন্যা তাঁর পছন্দ হয় না। রাজা চান এমন কন্যা বিবাহ করতে, যে কন্যা হবে অপরূপ রূপসী, আর দেহে রূপের সঙ্গে থাকবে বিদ্যাবুদ্ধি। যে-সব পাত্রী দেখছেন, তাদের মধ্যে যারা রূপসী, তাদের বিদ্যাবুদ্ধি নেই—যেন মাটির পুতুল! আবার যেসব পাত্রীর বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তারা এমন কুৎসিত যে তাদের দেখলে শিউরে উঠতে হয়। রাজার তাই বিবাহ আর হয় না।

একদিন মন্ত্রী বললেন—মহারাজ, আপনি যেমন পাত্রী চাইছেন, তেমন পাত্রী রাজা-রাজড়ার ঘরে মিলবে না। তেমন পাত্রী মিলতে পারে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে। আপনি সাধারণ গৃহস্থ ঘরে পাত্রীর সন্ধান করুন।

রাজা বললেন,—বেশ, আমি তাই করবো।

মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা রাজবেশ ত্যাগ করে এমনি সাধারণ মানুষের সাজে পুরী ত্যাগ করে পথে বেরুলেন—ঘোড়া নয়, হাতী নয়—পায়ে

হেঁটে—সঙ্গে সেপাই-শান্ত্রী লোকজন নিলেন না—নিলেন শুধু ছোট থলিতে করে একরাশ মোহর—পথের খরচের জন্য।

চলতে চলতে এ সহর ও সহর পার হয়ে এক সহরে এলেন ; পথে দেখলেন, একজন অতি সাধারণ ভদ্রলোক পথে চলেছেন—রাজা তাঁকে ডাকলেন—ও মশাই, শুনছেন ?—

ভদ্রলোক দাঁড়ালেন—বললেন—কিছু বলবেন ?····

রাজা বললেন—আপনি কোথায় চলেছেন ?

ভদ্রলোক বললেন—আমি বাড়ী যাচ্ছি—

কোথায় আপনার বাড়ী ?

—গ্রামে।

রাজা বললেন—আমাকে সঙ্গে নেবেন ? আমি আপনার সঙ্গে যাবো। যদি সঙ্গে নেন, তাহলে আপনাকে আমি ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাবো !

ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হলেন। লোকটা চলছে পায়ে হেঁটে—সঙ্গে ঘোড়া নেই অথচ বলে, ঘোড়ায় চরিয়ে নিয়ে যাবো।—তিনি ভাবলেন—মাথা খারাপ। ভদ্রলোক বললেন,—বেশ, চলো আমার সঙ্গে। কিন্তু তুমি তো পায়ে হেঁটে চলেছো—অথচ বলছো ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাবে—এ কথার মানে ?

রাজা শুধু ভদ্রলোকের পানে একবার চাইলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

দুজনে চলতে চলতে অনেক দূর এসে দেখেন, ক'জন মানুষ—কাঁধে খাটিয়া—'হরিবোল' বলে মড়া নিয়ে শ্মশানে চলেছে।

রাজা বললেন—ওরা কাঁধে খাটিয়ায় করে কি নিয়ে যাচ্ছে ?

ভদ্রলোক বললেন—মড়া নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছে।

রাজা বললেন—মড়া ! খাটিয়ার মানুষটি সত্যই মলো না বাঁচলো ?

ভদ্রলোক বললেন—তুমি তো আচ্ছা বোকা—বেঁচে থাকলে

কোনো মানুষকে কেউ খাটিয়ায় তুলে 'হরিবোল' বলতে বলতে কখনো শ্মশানে নিয়ে যায়!—

রাজা তাঁর পানে আবার তাকালেন—তাকিয়ে বললেন—ও

তারপর চলতে চলতে দুজনে এলেন পথের ধারে একটা খাবারের দোকানে—দুজনে কিছু কিনলেন—রাজা দিলেন দুজনের খাবারের দাম—বললেন—আমাকে আপনি সাথী করেছেন—আমি দেবো খাবারের দাম!

খাওয়া দাওয়া সেরে দুজনে আবার পথে বেরুলেন—যেতে যেতে দুজনে এলেন মাঠে—দুধারে ধানের ক্ষেত—মাঝখান দিয়ে পথ—ক্ষেতে ধান পেকে আছে—দেখে মনে হয় যেন ক্ষেত ভরে সোনার কুচি ছড়ানো।

রাজা বললেন—এ সব ধান কাটা হয়েছে, না, এখনো হয় নি?

ভদ্রলোক বললেন—তুমি তো আচ্ছা বেয়াকুব।—দেখছো গাছে-গাছে ধান পেকে রয়েছে, আর তুমি বলছো, এ সব ধান কাটা হয়েছে, না, কাটা হয়নি?

রাজা এ কথারও কোনো জবাব দিলেন না—শুধু সে ভদ্রলোকের পানে একবার তাকালেন।

ভদ্রলোক ভাবলেন—লোকটা হয় অজ-বেয়াকুব, না হয় মাথা-খারাপ।

দুজনে তারপর নানা কথা কইতে কইতে চলতে লাগলেন। রাজা বললেন—বাড়ীতে আপনারা ক'জন বাস করেন?

ভদ্রলোক বললেন—তিনজন···আমি, আমার স্ত্রী আর আমার একটি মেয়ে।···

রাজা বললেন মেয়ের বয়স কত?···

ভদ্রলোক বললেন—সতেরো-আঠারো বছর।

—বিবাহ হয়েছে?····

—না।···

রাজা বললেন—মেয়েটি সুন্দরী ?··

ভদ্রলোক বললেন—কুৎসিত নয়—গাঁয়ের সকলে বলে পরমা সুন্দরী !

রাজা বললেন—লেখাপড়া জানে মেয়ে ?····

—জানে।

রাজা বললেন বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন ?

ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন—কিন্তু সে বিরক্তি প্রকাশ না করে তিনি বললেন—বোকা নয়—বুদ্ধিমতী।

রাজা বললেন কাজকর্ম্ম জানে ?—

ভদ্রলোক বললেন—সব কাজে পটু !

—বটে। রাজা বললেন—আপনার সঙ্গে আপনার বাড়ী গেলে আপনার মেয়েটিকে দেখতে পাবো ?

ভদ্রলোক বললেন কেন পাবে না ?

তিনি ভাবলেন লোকটার মতলব কি ? আমার মেয়েকে বিবাহ করতে চায় নাকি ?—কিন্তু চাইলেই হলো ! বিবাহ দিচ্ছে কে এর সঙ্গে !—ঘর জানি না, দোর জানি না, তার উপর বেয়াকুব না পাগল—হুঁ :—

কথা কইতে কইতে চলে চলে সন্ধ্যার সময় দুজনে এসে পৌছুলেন মাঠের পর গ্রামে—এ ভদ্রলোকের বাড়ীতে।

রাজা বললেন—আপনার বাড়ীতে শুধু খাওয়া-দাওয়া করবো—তারপর কোনো অতিথিশালায় কিংবা মন্দিরের রোয়াকে শুয়ে রাত কাটাবো···শুধু আপনাদের সঙ্গে বসে খেতে চাই।—আপত্তি আছে ?

ভদ্রলোক বললেন—না—আপত্তি কিসের ? বেশ, তাই খেয়ো।

ভদ্রলোক বাড়ীতে ঢুকবেন, রাজা বললেন—একটা কথা····

ভদ্রলোক বললেন—বলো····

রাজা বললেন—আমার একটা বদ-স্বভাব আছে····আমি মাংস খাই····তার জন্য আপনাদের বিব্রত করতে চাই না····আমি নিজে একটা হাঁস কিনে আনবো····আসবার সময় দেখলুম, বাজারে বেশ পুরুষ্ট হাঁস বিক্রী হচ্ছে। তারপর আপনারা ভাত-রুটি যা খান, আমি খাবো।

ভদ্রলোক বললেন—বেশ····তাহলে বাড়ীতে আমি বলি····তুমি হাঁস নিয়ে এসো—তোমার যখন ইচ্ছা····তবে হাঁস আমিও কিনতে পারতুম।

সে কথার জবাব না দিয়ে রাজা গেলেন বাজারে এবং বাজার থেকে বেশ পুরুষ্ট একটি হাঁস কিনে ভদ্রলোকের দোরে এসে ডাকলেন—ও মশাই····

ভদ্রলোক এলেন—এসে খাতির করে রাজাকে এনে ঘরে বসালেন····রাজার হাত থেকে হাঁস নিয়ে ভদ্রলোক গেলেন অন্দরে—তারপর অন্দর থেকে বেরুলেন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে।

ভদ্রলোক পরিচয় দিলেন—ইনি আমার স্ত্রী····আর এটি আমার মেয়ে।

রাজা একাগ্রদৃষ্টিতে মেয়েকে দেখলেন, দেখে বললেন—চমৎকার বাড়ী...সুন্দর, তবে একখানি পাথরের যা অভাব!

ভদ্রলোক অবাক! ভাবলেন—মাথা-পাগলা মানুষ তো····দেখলো মেয়েকে,····আর বলচে—চমৎকার বাড়ী····সুন্দর!····ভদ্রলোক অতিথির কথা আগেই বলেছেন স্ত্রীকে, মেয়েকে····এখন বললেন স্ত্রীকে আর মেয়েকে—এঁকে জলখাবার খেতে দাও····রান্না হতে তো সময় লাগবে!

রাজা বললেন—পালক ছাড়িয়ে হাঁসটা আস্ত রেখে রাঁধবেন।

—আচ্ছা!····বলে স্ত্রী আর মেয়ে চলে গেল সেখান থেকে। খানিকক্ষণ পরেই মেয়ে নিয়ে এলো রেকাবিতে করে ফল আর মিষ্টি—সেই সঙ্গে সরবৎ—সেগুলি রেখে মেয়ে গেল চলে।

রাজা সরবৎ খেলেন, মিষ্টি খেলেন····তারপর দুজনে বসে নানা কথা····

রাত্রি হলো···ভদ্রলোকের স্ত্রী বললে—খাবার দেবো ?

রাজা বললেন—নিশ্চয়।

পাশের ঘরে চারিখানি আসন পাতা···মেয়ে লুচি-তরকারী এনে আসনের সামনে রাখলো—চারজনের খাবার····একটা বড় পাত্রে রাঁধা আস্ত হাঁস !

রাজা বললেন—একখানা ছুরি চাই····হাঁস আমি কেটে পরিবেষণ করবো।

ছুরি আনা হলো····রাজা তখন হাঁস কেটে হাঁসের মাথা দিলেন ভদ্রলোকের পাতে—ঠ্যাঙ দুটো দিলেন গিন্নীর পাতে—মেয়ের পাতে দিলেন ডানা দুটোর মাংস; কলজেটা চার টুকরো করলেন, করে সকলের পাতে এক-এক টুকরো—বাকি মাংস নিজের পাতে !

চারজনে বসে খাওয়াদাওয়া হলো। খাওয়াদাওয়ার পর গল্প···· গল্প করতে করতে রাত একটা বাজলো !

রাজা বললেন—ইস্····একটা বাজলো !····আমি এখন আসি, আপনারা ঘুমোতে যান !

ভদ্রলোক বললেন—এত রাত্রে না-ই বা গেলে ! এইখানেই শুয়ে পড়ো—আলাদা ঘর আছে—বিছানা আছে !

রাজা বললেন—না, না—আমি সরাইয়ে গিয়ে ঘুমোবো····কাছেই সরাই···সেখানে আমি ব্যবস্থা করে এসেছি !

ভদ্রলোক তবু অনেক অনুরোধ করলেন····রাজা সে অনুরোধ না শুনে এ বাড়ী থেকে বেরুলেন।

তিনি বেরিয়ে যাবার পর ভদ্রলোক বাড়ীর সদর বন্ধ করে ঘরে এলেন····ঘরে এসে শোয়া নয়, ঘরে বসে বাপ, মা আর মেয়ে তিনজনে এই আশ্চর্য্য অতিথির কথা····

বাপ বললেন—লোকটা হয় নিরেট বোকা, না হয় পাগল !

মেয়ে বললে—কেন ?

বাপ বললেন—পথে হঠাৎ দেখা ওর সঙ্গে। আমাকে বললে····

যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান সাথী করে তাহলে আপনাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাবো! কিন্তু কোথায় তার ঘোড়া? ঘোড়ার চিহ্ন নেই....পায়ে হেঁটে চলেছিল!

মেয়ে বললে—ও...তা, এ কথার মানে আছে, বাবা! মানে, একা-একা পথ চলতে হলে পথ যেন ফুরোতে চায় না—চলতে কষ্ট হয়! সঙ্গে একজন মানুষ থাকলে যত দূর পথ চলো, বোঝা যায় না—মনে হয় ঘোড়ায় চড়ে চলেছি...পথ চলতে তেমন কষ্ট হয় না!

রাজা তখন হাঁস কেটে......

মানে শুনে ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হয়ে তাকালেন মেয়ের দিকে—তারপর বললেন—তারপর শোন্ মা....

ভদ্রলোক বললেন—পথে আসবার সময় দেখি—'হরিবোল্' বলে ক'জন মানুষ খাটিয়ায় মড়া নিয়ে শ্মশানে চলছে····মড়া দেখে আমাকে বললে,—মানুষটা সত্যিই মারা গেল? না বাঁচলো? আমি বললুম—দেখছো, মরে গেছে—না হলে শ্মশানে নিয়ে যাবে কেন?

মেয়ে বললে—ওঁর এ কথা বলার মানে আছে, বাবা। সে মানে—যে-মানুষ জীবনে জাল-জুয়াচুরি বা কারো কোনো অহিত করে না, ভালো কাজ করে····মারা গেলে সে যায় স্বর্গে—ভগবানের কাছে···· সেখানে তার আসল বাঁচা! আর, কেউ যদি জীবনে অসৎ কাজ করে—পাপ আর অনাচার করে, তাহলে মরে সে নরকে যায়—নরকে পচে মরে। তাই উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মানুষটি ভালো ছিল না, মন্দ ছিল?

মেয়ের কথা শুনে বাপ অবাক!

ভদ্রলোক চুপ করে কি ভাবলেন, তারপর বললেন—বেশ, তোর এ-মানে মানলুম,—কিন্তু তারপর ক্ষেতে পাকা ধান ফলে আছে দেখে, ও বললে—এ ধান কাটা হয়ে গেছে? না, আকাটা? আমি বললুম—দেখছো, গাছে পাকা ধান রয়েছে, তবু বলছো—কাটা হয়েছে? না, আকাটা?

মেয়ে বললে—এ কথার মানে আছে, বাবা! ওঁর এ কথা বলার মানে—ধানগাছের মালিক অনেক সময় ধান পাকবার আগেই সে ধান বেচে টাকা নেয়—তার পক্ষে তাহলে ও ধান কাটা হয়ে গেছে বললে চলে—তাই উনি ও-কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ও ধান মালিক আগেই বেচে দিয়েছে? না, বেচেনি?····

ভদ্রলোক অবাক হয়ে মেয়ের পানে তাকালেন····তারপর বললেন····বেশ, তাও না হয় মানলুম····কিন্তু এখানে এসে তোকে দেখে বললে কি না—বাড়ীটি চমৎকার····সুন্দর—শুধু একখানি পাথর খসে গেছে! দেখলে তোকে, আর বললে কি না—বাড়াটি চমৎকার—

শুধু একখানা পাথর খসে গেছে! বাড়ীর কোথায় পাথর যে ও বললে, একখানা পাথর খসে গিয়েছে?

হেসে মেয়ে বললে—আমাকে উদ্দেশ করেই উনি ও-কথা বলেছেন, বাবা! উনি যে রকম নিবিষ্ট মনে আমাকে দেখছিলেন, তাতে আমি হেসেছিলুম—আমার সামনের একটি দাঁত পড়ে গেছে—উনি তাই দেখে ও-কথা বলেছেন....বলেছেন, বাড়ী সুন্দর, শুধু একখানি পাথর খসে গিয়েছে!

বাপ বললেন—তারপর ঐ হাঁস ভাগ করে পরিবেষণ!

মেয়ে বললে—তাতেও ওঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, বাবা! তুমি হলে সংসারের মাথা....তাই তোমার পাতে দিয়েছেন হাঁসের মাথা, মা এ সংসারকে ধরে আছে....সংসারের যত দায়, মার উপর.... তাই মাকে দিয়েছেন, হাঁসের দুখানি পা। আমি মেয়ে....চলে ফিরে সংসারের ফাইফরমাশ খাটি....তাই আমাকে দিয়েছেন হাঁসের দুটি ডানা। আর, কল্‌জে কেটে চার টুকরো করে চারজনকে দেওয়া.... তার মানে—কল্‌জে বা ছাতি হলো সব জীবের আসল জিনিষ....তাই সকলকে ঐ কল্‌জের ভাগ দিয়েছেন।

মেয়ের কথা শুনে ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হলেন....বললেন—বটে! তাহলে মানুষটি তো পাগল নয়, পরম জ্ঞানী!

মেয়ে বললে—বটেই তো!

ভদ্রলোক বললেন—কিন্তু হঠাৎ তিনি এলেন আমার বাড়ী!

মেয়ে বললে—হয়তো তার কোন অর্থ আছে!....

ভদ্রলোক বললেন—হুঁ!...

পরের দিন রাজা আর এ বাড়ীতে এলেন না—তার পরের দিনও না। ভদ্রলোক অবাক! তিনদিনের দিন রাজার দূত এলো—সঙ্গে সেপাই-শান্ত্রী! কি ব্যাপার?....দূত দিলে চিঠি—রাজার চিঠি....

ভদ্রলোককে রাজা তাঁর সভায় তলব করেছেন! ভদ্রলোক ভয়ে কাঁটা! কি অপরাধ করেছেন যে রাজার সভায় তলব!

অমান্য করা চলে না। তিনি চললেন দূতের সঙ্গে রাজার সভায়।

ভদ্রলোককে খাতির করে আসনে বসিয়ে রাজা বললেন—আমাকে চিনতে পারছেন? সেই পথ থেকে আপনার সাথী হয়ে আপনার বাড়ী গিয়েছিলুম? আমাকে আপনি বলেছিলেন—নিরেট বোকা···বলেছিলেন, পাগল! তা যাক—আপনার মেয়েটিকে আমি বিবাহ করতে চাই—আপনার মেয়ে রূপসী, বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী!

ভদ্রলোকের মুখে কথা নেই···তিনি অবাক হয়ে চেয়ে আছেন রাস্তার দিকে!

হেসে রাজা বললেন—সে রাত্রে আপনার বাড়ী থেকে বেরুলুম সরাইয়ে যাবো বলে···আপনি সদর বন্ধ করলেন···আমি দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলুম!···ঘরে আপনাদের কথা হচ্ছিল—আপনি সেই মড়ার কথা···ধানের কথা···বলছিলেন—আপনার মেয়ে আমার সে সব কথার যে মানে বলেছিলেন—তাতেই বুঝেছি, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি কত!···আজ থেকে সাতদিন পরে বিবাহ। আপনি বিবাহের আয়োজন করুন গিয়ে।

মহা-সমারোহে ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে হলো রাজার বিবাহ···ভদ্রলোককে রাজা দিলেন তাঁর সভায় প্রধান অমাত্যের আসন।

তিনটি স্বপ্ন
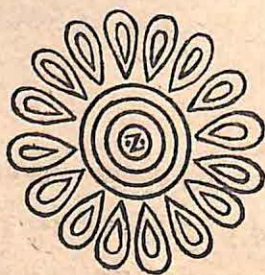
এক রাজা সুখে রাজ্য করেন। রাজার যেমন প্রতাপ, তেমনি সকলের উপরে স্নেহ-মায়া-মমতা। রাজার দয়ায় রাজ্যে দীন-দুঃখী কেউ নেই।

একদিন রাত্রে রাজা ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন দেখলেন—তাঁর ঘরের কড়িকাঠে ল্যাজ-বাঁধা একটা শেয়াল ঝুলছে। রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল, মন হলো খারাপ—এমন বেয়াড়া স্বপ্ন কেন দেখলেন।

সে-রাত্রে রাজার আর ঘুম হলো না। সকালে সভায় এলেন—সভায় মন্ত্রী-সভাসদ, অমাত্যরা আছেন। রাজা বললেন সকলকে তাঁর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত। বলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এ স্বপ্নের অর্থ কি?

মন্ত্রী আর অমাত্যরা অনেক ভেবেও অর্থ বলতে পারলেন না। রাজার সভাপণ্ডিত এলেন, জোতিষী এলেন—এ স্বপ্নের অর্থ তাঁরাও বলতে পারলেন না। রাজা বললেন—এ স্বপ্নের অর্থ না জানতে পারলে আমার মনের অস্থিরতা যাবে না—রাজকার্য করতে পারবো না।

ঢেঁড়া দেওয়া হলো, রাজা রাত্রে ল্যাজ-বাঁধা শেয়াল ঝোলার স্বপ্ন

দেখেছেন—যে এ স্বপ্নের অর্থ বলতে পারবে, তাকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজার ঢাঁড়া শুনে দলে দলে লোক আসতে লাগলো—কিন্তু কেউ স্বপ্নের অর্থ বলতে পাল্লে না।

এক গরীব চাষা তারো হলো লোভ—যদি অর্থ বলতে পারে—অনেক পুরস্কার পাবে। অর্থ ভাবতে ভাবতে চাষা চলছে রাজার সভায়।

যেতে যেতে দেখে, সামনে বড় একটা সাপ শুয়ে আছে। চাষাকে দেখে সাপ বললে—কি গো মানুষ, একা ভাবতে ভাবতে কোথায় চলেছো?

চাষা বললে—মহারাজ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর ঘরের কড়িকাঠে ল্যাজ-বাঁধা একটা শেয়াল ঝুলছে। এ স্বপ্নের অর্থ বলতে হবে—বলতে পারলে মহারাজ অনেক টাকা পুরস্কার দেবেন। তাই চলেছি রাজার দরবারে। অর্থ পাচ্ছি না—তুমি বলে দেবে এ স্বপ্নের অর্থ?

সাপ বললে—পুরস্কার যা পাবে, তার অর্ধেক আমাকে দেবে কথা দাও। তাহলে বলে দেবো এর অর্থ।

চাষা বললে—এ স্বপ্নের অর্থ—রাজ্যে সকলের মনে শুধু এখন শঠতা, চাতুরী, আর বেইমানী চলেছে—তাই মহারাজ এ স্বপ্ন দেখেছেন—শেয়াল হলো অত্যন্ত ধূর্ত বেইমান—বুঝেছো?

অর্থ পেয়ে চাষা হন্‌হন্ করে চলে গেল।

পুরীর দ্বারে তাকে আটকায়। চাষা বলে—আমি এসেছি মহারাজের স্বপ্নের অর্থ বলতে।

তারা হাসলো। বললে—বড় বড় পণ্ডিতরা অর্থ বলতে পারছেন না,—আর তুই মুখ্যু চাষা—তুই বলবি অর্থ!

যাই হোক, রাজার হুকুম-দ্বারী তাকে আটকাতে পারলো না—চাষা এসে প্রণাম করে রাজার সামনে দাঁড়ালো।

চাষা বললে—আমি বলবো মহারাজ, স্বপ্নের অর্থ।

রাজা বললেন—বলো।

তখন চাষা বললে—রাজ্যে সকলের মনে এখন শঠতা, চাতুরী আর বেইমানী চলেছে মহারাজ—তাই আপনি শেয়ালের স্বপ্ন দেখেছেন।

রাজা শুনে খুশী হলেও—মন্ত্রী অমাত্য সভাসদের দল অর্থ শুনে চমকে উঠলেন। রাজা দিলেন চাষাকে পুরস্কার—একশো মোহর!

মোহর নিয়ে চাষা বেরুলো পুরী থেকে—বেরিয়ে ভাবলো হুঁঃ, সাপকে আমার এ মোহরের ভাগ দেবো কি? মোহর নিয়ে সাপ করবে কি?—আমি গরীব মানুষ—এ মোহরে আমার কত লাভ। কিন্তু পাছে সাপের সঙ্গে দেখা হয়—এ জন্য চাষা অন্য পথে বাড়ী ফিরলো।

তারপর দিন যায়—মাস যায়—রাজা আবার রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন। এবারের স্বপ্ন, তাঁর ঘরের কড়িকাঠে একখানা খোলা তলোয়ার ঝুলছে।

রাজা পরের দিন সকালে চাষার কাছে লোক পাঠালেন। লোক গিয়ে চাষাকে বললে—কাল রাত্রে মহারাজ আবার স্বপ্ন দেখেছেন। এবারে শেয়ালের স্বপ্ন নয়—এবার স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর ঘরের কড়িকাঠে খোলা তলোয়ার ঝুলছে। তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—এ স্বপ্নের অর্থ বলগে গিয়ে।

চাষা শিউরে উঠলো। সর্বনাশ! সাপের কাছে কোন মুখে যাবে—পুরস্কারের অর্ধেক ভাগ দেবে বলেছিল, দেয় নি—পাছে সাপের সঙ্গে দেখা হয়, এই ভয়ে সে তারপর থেকে আর ওপথ মাড়ায় নি!

কিন্তু রাজার তলব—যেতেই হবে! রাজার লোককে বললে তুমি এগোও—আমি সাজ-পোষাক পরে এখনি যাচ্ছি।

লোক চলে গেলে চাষা সাজপোষাক পরে পথে বেরুলো—ভাবলো একটু চক্ষুলজ্জা—তা হোক! সে সেই আগেকার পথ ধরে চললো—সাপের সঙ্গে দেখা।

সাপ বললে—ব্যাপার কি?

চাষা বললে—মহারাজ আবার স্বপ্ন দেখেছেন—এবারে শেয়াল

নয়—ছাদের কড়িকাঠে তলোয়ার ঝুলছে। এ স্বপ্নের অর্থ বলে দিতে হবে।

সাপ বললে—যা পাবে, তার অর্ধেক ভাগ।

চাষা বললে—লজ্জা দিয়ো না ভাই—সেবারে ভুলে বাড়ী চলে গিয়েছিলুম—তারপর নানা কাজে ব্যস্ত ছিলুম এদিকে আসতে পারিনি—আজ অর্থ-টর্থ যা পাবো তার অর্ধেক না দিয়ে যাবো না।

সাপ বললে—কথা দিচ্ছ! সাফ কথা।

চাষা বললে—সাফ কথা—পাকা কথা।

সাপ বললে—এ স্বপ্নের অর্থ—যুদ্ধ হবে। ঘরে-বাহিরে শত্রু—সকলে মিলে যুদ্ধের আয়োজন করছে।

অর্থ নিয়ে চাষা দাঁড়ালো রাজার দরবাড়ে—এ স্বপ্নের অর্থ বললো। বললে—ঘরে-বাহিরে শত্রু মিলে যুদ্ধের জন্য আয়োজন করছে!

প্রতাপশালী রাজা—তিনি হুঁশিয়ার হয়ে যুদ্ধের আয়োজনে মন দিলেন।....

চাষা ফিরলো বাড়ীর দিকে—এবারে সাপ আছে যে পথে সেই পথেই আসছে। সাপের সঙ্গে দেখা—সাপ বললে—আমার ভাগ?

চাষা একখানা বড় পাথর তুলে বললে—দিচ্ছি পুরস্কারের ভাগ—এই পাথরের একটি ঘা।

চাষা পাথর ছুঁড়বে, সাপ ভয়ে তার গর্তে গিয়ে সেঁধুলো—ল্যাজটা গর্তের বাহিরে—চাষার হাতে ছিল কাস্তে—সেই কাস্তে দিয়ে মারলো একটি চোট সাপের ল্যাজে। সাপের ল্যাজ গেল কেটে।

তারপর রাজ্যে চললো যুদ্ধ—বিরামহীন যুদ্ধ। শত্রুরা হারছে, মরছে—তবু যুদ্ধ শেষ হয় না!

রাজা রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখলেন। এবার স্বপ্ন দেখলেন কতকগুলো ভেড়া ঘুরছে তাঁর ঘরে।

সকালে সভায় এসে চাষাকে ডেকে পাঠালেন—লোক গিয়ে চাষাকে

বললে—কাল রাত্রের স্বপ্ন—ঘরের মধ্যে একপাল ভেড়া—মহারাজ ডেকেছেন, চলো এ স্বপ্নের অর্থ বলতে হবে।

চাষার এবার ভয় হলো—তাইতো—এবার আর রক্ষে নেই—সাপের ল্যাজ কেটে দিয়ে এসেছে—সে কি অর্থ বলবে! অর্থ বলা কি, হয়তো দেখা হলেই একটি ছোবল!

যাই হোক, এধারে সাপের ছোবলের ভয়, ওদিকে রাজার ডাক—সভায় না গেলে গর্দানা।
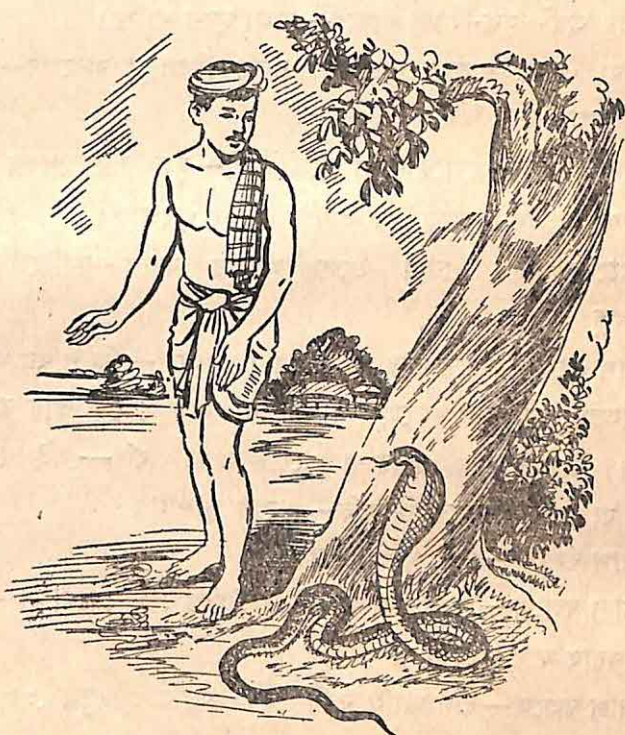
সাপ বললে—ব্যাপার কি?

চাষা এলো সেই পথে—সাপের সঙ্গে দেখা।

চাষা বললে—কিছু মনে করো না ভাই—অন্যায় করেছিলুম।

সাপ বললে—সে কথা যাক! এবারে কি স্বপ্নের অর্থ চাই?

চাষা বললে—মহারাজ স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর ঘরে একপাল ভেড়া ঘুরছে।

সাপ বললে—বলবো অর্থ—কিন্তু যা পাবে, তার অর্ধেক ভাগ পাবো? না, পাথর ছুড়ে মারবে?

চাষা বললে—না না লজ্জা দিয়ো না। যা হয়ে গেছে তার জন্য মাপ করো। দেবো, দেবো তোমাকে অর্ধেক ভাগ।

সাপ বললে—এ স্বপ্নের অর্থ—ভেড়া হলো খুব নিরীহ প্রাণী। এ স্বপ্নের অর্থ—যুদ্ধ-বিগ্রহ থামবে—রাজ্য জুড়ে শান্তি।

চাষা এলো রাজার সভায়। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—এবারে ভেড়ার স্বপ্ন—তার অর্থ?

চাষা বললে—এবারে রাজ্য জুড়ে শান্তি—যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ।

রাজা দিলেন চাষাকে এক হাজার মোহর পুরস্কার।

মোহের নিয়ে চাষা এলো সাপের কাছে—ডাকলো, সাপ, সাপ বন্ধু—

সাপ এলো বেরিয়ে তার গর্ত থেকে। বললে—কি পাথর মারবে?

লজ্জা পেয়ে চাষা বললে—না না, যা হয়ে গেছে তার জন্য মাপ করো। এবারে নাও, এবার যা পেয়েছি তার অর্ধেক—সেই সঙ্গে গেল দু'বার যা পেয়েছি তারো আর্ধেক—অর্ধেক দু'ভাগ।

সাপ বললে—বেশ, দাও, নেবো।

চাষা বললে—যে অন্যায় করেছি তার জন্য রাগ রেখো না—আমার সে অপরাধ মাপ করো।

সাপ বললে—রাগ আমি করি নি। আমি জানতুম গেল দু'বার তুমি যা করেছো, তা হয়েছে তোমার দোষে নয়—কালের দোষে!

চাষা বললে—তার মানে?

সাপ বললে—প্রথম বারে বলেছিলুম রাজ্যে সকলের মনে ছল-চাতুরী, বেইমানী আর শাঠ্য—তুমিও এ-রাজ্যের প্রজা তো—কাজেই তোমারো মনে শঠতা আর চাতুরী করবার লোভ জেগেছিল, তাই তুমি

সেবারে এ পথ দিয়ে বাড়ী না ফিরে অন্য পথে বাড়ী ফিরেছিলে। দ্বিতীয় বারে রাজ্যে যুদ্ধের ঘোষণা—তাই তুমি আমার ল্যাজ কেটে দিয়েছিলে। আর এবারে শান্তি—সকলেরই ফিরেছে ভাগ্য—তাই তুমি যেচে তিনবারের ভাগ এক সঙ্গে দিচ্ছ!

মণি-রত্নের পাহাড়
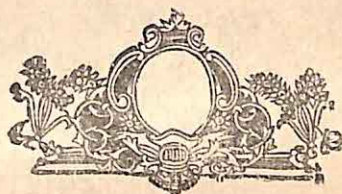
এক বিধবা—বিধবার একটি ছেলে, আর কেউ নেই। বিধবা বড় গরীব। পাঁচ বাড়ীতে এ কাজ ও কাজ করে যা পায়, তাতেই খাইয়ে পরিয়ে ছেলেটিকে লালনপালন করে।

ছেলে ক্রমে ডাগর হলো—মাও বুড়ো হলো। মা এখন আগেকার মতন খাটতে পারে না, কাজেই সংসার প্রায় অচল। মা একদিন ছেলেকে বললে,—বাবা দলীপ, আমি এখন বুড়ো হয়েছি, খাটতে পারি না। তুমি ঘুরেফিরে একটা কাজের চেষ্টা করো। রোজগার যা হবে তাতে সংসার চলবে।

ছেলে দলীপ মার কথা শুনে রোজগারের চেষ্টায় বাড়ী থেকে বেরুলো! এ বাড়ী, ও বাড়ী, এ দেশ, ও দেশ ঘুরে কোথাও চাকরি পেলো না—মাসখানেক পরে এলো এক সহরে—এসে খুব বড় এক ধনীর বাড়ীতে ঢুকে মালিকের সঙ্গে দেখা করলো। মালিক রূপোর গড়গড়ায় তামাক টানছিল, বললে,—কি চাই?

দলীপ বললে,—চাকরি। আমায় যে কাজ বলবেন করবো, যে মাহিনা দেবেন তাতেই কাজ করবো।

মালিক বললে,—বেশ—থাকো, ভাল মাহিনা দেবো—যে কাজ করতে বলবো, সে কাজ করতে হবে।

দলীপ বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দলীপের চাকরি হলো। তারপর তিন-চারদিন এসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনিবের বৈঠকখানার দরজায় বসে থাকে, মনিব কোন কাজ ফরমাস করে না!

পাঁচদিনের দিন দলীপ এসে মনিবকে বললে,—আজ্ঞে আমি চার-দিন খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি, আমায় কোন কাজ দিচ্ছেন না! কাজ ফরমাস করুন।

মনিব বললে,—বটে! বটে! কাল কাজ দেবো। মনে আছে যে কাজ বলবো তাই তুমি করবে বলেছ?

মাথা নেড়ে দলীপ বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরের দিন সকালে দলীপ এসে মনিবের সামনে দাঁড়ালো কাজের ফরমাস পাবার জন্য। মনিব বললে,—আমার কারখানা-ঘরে যাও—সেখানে দেখবে বলদের চামড়ার থলি আছে—একটা খলি নিয়ে এসো আর সেই সঙ্গে নিয়ে এসো বড় দুটো চটের থলি।

দলীপ থলি নিয়ে এলো। মনিব তখন ঘোড়ায় চড়ে পথে বেরুলো দলীপকে সঙ্গে নিয়ে, আর নিলো একটা গাধা। নিজে ঘোড়ায় চেপে বসলো; দলীপকে বললে,—গাধার পিঠে ঐ থলি তিনটি চাপিয়ে গাধার দড়ি ধরে আমার সঙ্গে চল।

ঘোড়ার পিঠে মনিব আর গাধার দড়ি ধরে চলে দলীপ—গাধার পিঠে বলদের চামড়ার খলি আর দুটো চটের থলি। চলে চলে দুজনে সহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে নির্জন মাঠের কোলে খুব উঁচু মস্ত এক পাহাড়ের সামনে পৌঁছুলো। পৌঁছে ঘোড়া থেকে মনিব নামলো; নেমে দলীপকে বললে,—এই বলদের চামড়ার থলিটা এখানে পাত।

মনিবের কথায় দলীপ বলদের চামড়ার থলিটা গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে মাঠের উপর রাখলো। মনিব বললে,—দেখ দিকিনি, এই থলির মধ্যে তুমি ঢুকতে পার কিনা ?

কথাটা অদ্ভুত—অর্থ না বুঝে দলীপ চেয়ে রইলো মনিবের মুখের পানে। মনিব বললে,—কি ভাবছো ? যে কাজ ফরমাস করবো তুমি করবে—তোমার সঙ্গে এই ত সর্ত্ত।

দলীপ ভাবলো, ঠিক কথা। সে বলদের চামড়ার থলির মধ্যে ঢুকলো। যেমন ঢোকা মনিব অমনি থলির মুখটা চামড়ার ফিতা দিয়ে কড়াক্কড় করে কষে বাঁধলো—বেঁধে সে থলি মাঠের উপর রেখে মনিব লুকোলো পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে।

একটু পরেই কোথা থেকে উড়ে এলো মস্ত দুটো শকুনি। শকুনি দুটো ভাবলো মড়া বলদ পড়ে আছে তারা বলদের চামড়ার থলির মধ্যে পোরা দলীপকে নিয়ে উড়ে পাহাড়ের চূড়ায় বসলো—বসে ঠুকরে ঠুকরে চামড়াটা ছিঁড়ে ফেললো। ছিঁড়ে ফেলতেই দলীপ বেরুলো থলির ভিতর থেকে। কোথায় মড়া বলদের মাংস খাবে, না, জ্যান্ত মানুষ ! ভয় পেয়ে শকুনি দুটো উড়ে পালিয়ে গেল।

দলীপ তখন উঠে দাঁড়ালো ; দাঁড়িয়ে নীচে মাঠের দিকে চেয়ে দেখে মনিব ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে।

দলীপকে দেখে মনিব বললে,—পাহাড়ের মাথায় যেখানে তুমি দাঁড়িয়েছো, ওখানে দেখবে, রাশি রাশি হীরা, চুনী, পান্না—নানা মণি-রত্ন। সেগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে তুমি নীচে ফ্যালো। আমি সেগুলো কুড়িয়ে এই চটের থলি দুটো বোঝাই করি।

দলীপ তখন চেয়ে দেখে পাহাড়ের মাথায় সাদা, লাল, সবুজ, হলদে ....নানা রঙের জেল্লাদার মণি-রত্ন ডাঁই হয়ে আছে। মনিবের দিকে চেয়ে সে বললে,—এই উঁচু পাহার থেকে আমি নামবো কি করে ?

মনিব বললে,—তার জন্য ভোবো না। আমার থলি দুটো বোঝাই হলেই তোমার নামিয়ে আনবার ব্যবস্থা করবো।

মনিবের কথায় বিশ্বাস করে দলীপ মণি-রত্ন ছুঁড়ে ছুঁড়ে নীচে ফেলতে লাগলো—মনিব সেই মণি-রত্নে চটের থলি দুটো বোঝাই করে গাধার পিঠে সেই থলি দুইটি চাপিয়ে ঘোড়ায় চাপল এমন সময় দলীপ বললে,—আমি নামবো কি করে ?

মনিব বললে,—ওখানে দেখবে অনেক মানুষের হাড়গোড় পড়ে আছে, কেমন ত !

দলীপ দেখে তাই বটে। মানুষের অনেক হাড়গোড় চারিদিকে ছড়ান দেখে সে ভয়ে শিউরে উঠলো।

মনিব বললে,—তোমার মত আমার অনেক চাকরকে এর আগে বলদের চামড়ার থলিতে পুরে পাহাড়ে তুলেছি, তারাও এমনি করেই মণি-রত্ন ছুঁড়ে আমার অনেক থলি ভর্ত্তি করেছে। পাহাড় থেকে কেউ নামে নি, তুমিও নামবে না। তোমার হাড়গোড় ওদের হাড়গোড়ের সঙ্গে মিশে থাকবে।

এই কথা বলে হা-হা করে হেসে মণি-রত্নের থলি নিয়ে মনিব ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

দলীপের চোখের সামনে অন্ধকার—যে রকম খাড়া পাহাড়, তেমনি উঁচু—কোথা দিয়ে নামবে ?

দলীপ ভাবছে আর ভাবছে···এমন সময় এক প্রকাণ্ড বাজপাখী পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। কোথায় নীচে কোন মাঠে গরু বাছুর ছাগল ধরবে ছোঁ মেরে, সেই সন্ধানে—হঠাৎ সেই বাজপাখী দেখে পাহাড়ের মাথায় জ্যান্ত মানুষ ! যেমনি সে নেমে আসছে ছোঁ মারবে বলে, দলীপ বাজপাখীর পা দুখানা জাপ্‌টে ধরলো। বাজপাখী এমন ফ্যাসাদে কখনও পড়ে নি—সে ভাবলো কোন গাছের শিকড়ে তার পা জড়িয়ে আটকে গেছে। পা থেকে সেই শিকড় ঝেড়ে ফেলবার জন্য সে অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু শিকড় আর পা ছাড়ে না। তখন শিকড়শুদ্ধ বাজপাখী আকাশে উড়লো। উড়তে উড়তে যেই শিকড়

ঝেড়ে ফেলবার জন্য প্রাণপণ তার চেষ্টা—কিন্তু শিকড় নহি ছোড়তা হ্যায়। শেষে বাজপাখী হয়রান হয়ে অনেক দূরে নীচে জমিতে নামলো। জমি পাবামাত্র দলীপ বাজপাখীর পা ছেড়ে দিল এবং শিকড়ের বাঁধন থেকে খালাস পেয়েছে বুঝে বাজপাখী উড়ে পালালো।

মরণের হাত থেকে প্রাণ ফিরে পেয়ে দলীপ ঘুরতে ঘুরতে ক'দিন পরে সেই মনিবের সহরে পৌঁছুলো। সেখানে এক দোকানীর কাছে কিছু খাবার চেয়ে খেয়ে সে এক গাছতলায় বসে আছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে ওর সেই মনিব পথে চলেছে। উঠে সে এসে মনিবকে বললে,—আমায় চাকর রাখবেন? যে কাজ ফরমাস করবেন আমি তাই করবো।

মনিব বড়লোক—কত মানুষের সঙ্গে তার কারবার—সকলের মুখ তার মনে থাকে না। দলীপকে দেখে মনিব চিনতে পারলো না এ তার সগু পাহাড়ে ফেলে আসা চাকর।

মনিব বললে,—বেশ এস আমার সঙ্গে।

মনিবের সঙ্গে দলীপ এলো মনিবের বাড়ী! সেই বাড়ী! সেবারের মত চারদিন নিষ্কর্ম্মা বসে থাকার পর পাঁচ দিনের দিন মনিবের ফরমাসে দলীপ চললো সেই পাহাড়ের দিকে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে মনিব চলছে আর তার পিছনে গাধার দড়ি ধরে দলীপ....গাধার পিঠে বলদের চামড়ার তৈরী একটা থলি আর চটের বড় দুটো থলি! পাহাড়ের কোলে এসে মনিব বললে,—গাধার পিঠ থেকে বলদের চামড়ার থলিটা নামাও! দলীপ এখন জানে, এর পর কি হুকুম হবে। কোন কথা না বলে সে বলদের চামড়ার থলি নামিয়ে মাঠের উপর রাখলো।

মনিব বললে,—দেখ দেখিনি এই থলির মধ্যে ঢুকতে পার কি না।

দলীপ বললে,—আজ্ঞে তা তো বলতে পারি না। আপনি যদি দেখিয়ে ছান কি ভাবে ঢুকতে হয়, তা হলে দেখে আমি ঢুকবো।

বেশ! মনিব বলদের চামড়ার থলির মধ্যে ঢুকলো—তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

মনিব যেই ঢুকেছে দলীপ অমনি চামড়ার ফিতা দিয়ে থলির মুখ কড়াকড় করে বাঁধলো। থলির মধ্যে থেকে মনিব চীৎকার করতে লাগলো,—আরে করিস কি ? করিস কি ?

দলীপ বললে,—আজ্ঞে কি করছি এখনই বুঝবেন।

মনিবের বুঝতে দেরী হলো না। তখনি দুটো শকুনি এসে সেই থলি নিয়ে উড়ে পাহাড়ের মাথায় বসলো।

দলীপ বাজপাখীর পা দুখানা জাপ্‌টে ধরে

ঠুকরা-ঠুকরি করে শকুনিরা থলির চামড়া ছিঁড়তেই ভিতর থেকে বেরুলো জ্যান্ত মানুষ ! শকুনি ভয়ে উড়ে পালিয়ে গেল।

থলি থেকে বেরিয়ে মনিব দাঁড়ালো—নীচের দিকে চেয়ে দেখে··· দলীপ পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে।

মনিব বললে দলীপকে, আমি নামবো কি করে ?

দলীপ বললে,—আজ্ঞে ওখান থেকে মণি-রত্ন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলুন, আমি থলি দুটো ভর্ত্তি করি। তারপর আপনাকে নামিয়ে আনবো।

মনিব কি করে—ধড়াদ্ধড় মণি-রত্ন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। দলীপ সে সব মণি-রত্ন দিয়ে থলি দুটো ভর্ত্তি করে গাধার পিঠে চাপালো।

উপর থেকে মনিব হাঁকলো,—আমার নামবার ব্যবস্থা ?

দলীপ বললে,—আমাকে চিনতে পারেন নি ? আমি আপনার সেই চাকর দলীপ। আমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছিলেন, আপনারও তাই হবে। আমার মত যে সব চাকরকে আগে ঐ পাহাড়ে পাঠিয়েছিলেন তাদের হাড়গোড় পড়ে আছে ত ? তাদের হাড়গোড়ের সঙ্গেই ঐ মণি-রত্ন নিয়ে থাকবেন। নেমে আর কি হবে ?

এই কথা বলে দুই থলি মণি-রত্ন নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দলীপ চললো তার মার কাছে নিজের বাড়ীতে।
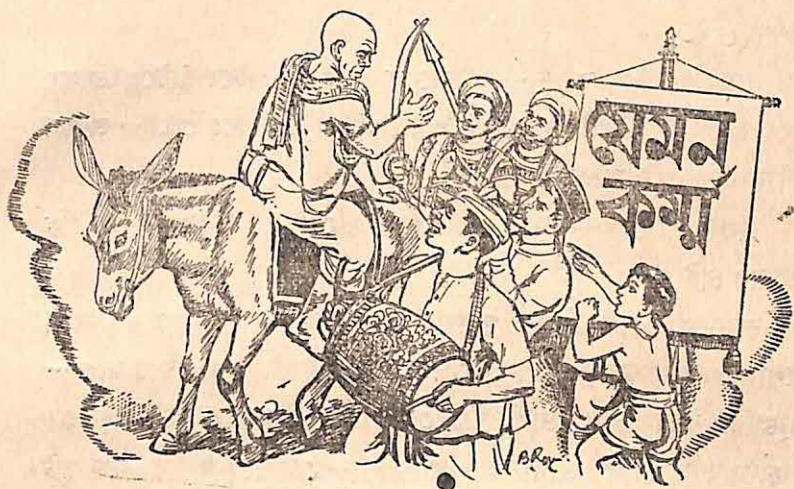
গ্রামে থাকেন এক ব্রাহ্মণ আর তাঁর ব্রাহ্মণী। গ্রামে আগে দোল-দুর্গোৎসব হতো, পূজাপার্বণ হতো, ব্রাহ্মণ পূজা-অর্চনা করে দক্ষিণা আর নৈবেদ্য যা পেতেন, তাতে সংসার বেশ চলতো। এখন লোকের অবস্থা খারাপ, পয়সার টানাটানি, কাজেই দোল-দুর্গোৎসব পূজা-পার্বণের পাট ক্রমে একরকম উঠেই গেছে। সেজন্য ব্রাহ্মণকে এখন নিরুপায়ে ভিক্ষায় বেরুতে হয়। ভিক্ষাই কি তেমন মেলে....কোনো দিন ঘুরে-ঘুরে আধসের চাল কি দু' আনা পয়সা....সংসার ক্রমে অচল হলো।

গ্রামের লোকেরা একদিন ব্রাহ্মণকে বললে—গ্রামের অবস্থা তো দেখছেন, ঠাকুর....ভিক্ষা দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমরা বলি, এ-রাজ্যের রাজার কাছে আপনি যান। আপনি পণ্ডিত মানুষ....খেতে পাচ্ছেন না শুনলে তিনি আপনাকে মাসকাবারী দেবেন। কালই আপনি যান....কাল আবার রাজার মায়ের শ্রাদ্ধ....রাজা ব্রাহ্মণদের অনেক কিছু দানটান করবেন।

এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ পরের দিন বেরুলেন রাজধানীর দিকে....পরণে

ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে ময়লা উড়ানি....লজ্জা করছে, কিন্তু উপায় নেই!

রাজধানী কি কাছে....সে অনেক দূরে!....হাঁটতে-হাঁটতে ব্রাহ্মণ যখন রাজপুরীতে পৌঁছলেন, তখন দানের পর্ব শেষ হয়ে গেছে....ব্রাহ্মণ মলিন মুখে এসে সভায় দাঁড়ালেন।

রাজা বললেন—বড় দেরী করে এসেছো, ঠাকুর!....তা কি তোমার চাই?....

রাজাকে ব্রাহ্মণ নিজের দুর্দশার কথা বললেন। রাজার মমতা হলো....রাজা বললেন—যখন এসেছো, তখন একটা সিধা নিয়ে যাও.... চ্যাঙারি করে চাল, ডাল, ঘী, তেল, লবণ, কাপড় আর চাদর। তাছাড়া তুমি রোজ এসো আমার কাছে....তোমাকে আমি রোজ দুটি করে টাকা দেবো....তাতে চলবে তো ঠাকুর? রোজ দু'টাকা....তার মানে, মাস যাট টাকা!....

ব্রাহ্মণের দু'চোখ ছলছলিয়ে এলো....ব্রাহ্মণ বললেন—আপনার অসীম দয়া, মহারাজ!....ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। কিন্তু আমি থাকি অনেক দূরের গ্রামে—একবেলার পথ....আমার যেতে-আসতেই তো....

রাজা বললেন—বুঝেছি। তাহলে এক কাজ করো ঠাকুর! হপ্তায় তুমি দু'দিন করে এসো....একবার পাবে ছ'টাকা, আরেকবার পাবে আট টাকা—সাতদিনে চোদ্দটাকা....কেমন?....

ব্রাহ্মণ বললেন—কি আর বলবো, মহারাজ....আপনার এ দয়ার দানে এখন সুখেই থাকতে পারবো!

সিধা আর সেই তিনদিনের ছ'টি টাকা নিয়ে ব্রাহ্মণ চলে এলেন। তারপর থেকে হপ্তায় দু'দিন করে ব্রাহ্মণ আসেন রাজার কাছে....রাজা তাঁকে সিংহাসনের কাছে ডেকে এনে তাঁর গ্রামের সব খবর নেন.... নিজের হাতে ব্রাহ্মণকে টাকা দেন!

এমনি ভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে চলেছে....

এখন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীর কোনো অভাব নেই····দুজনে পরম সুখে বাস করেন!

ব্রাহ্মণের এ সুখে কিন্তু রাজবাড়ীর পেট-মোটা পুরুতের চোখ টাটালো। পুরুতকে রোজ ভোরে উঠে স্নান করে রাজপুরীর বারোটি মন্দিরে পূজা করতে হয়····দুপুরে বারোটি ঠাকুরের ভোগ দেওয়া···· তারপর রাত্রে আরতি করা! এত পরিশ্রম করে তাকে রোজগার করতে হয়।····আর, এই ব্রাহ্মণকে কোনো কাজ করতে হয় না···· কোনো পরিশ্রম নেই····হপ্তায় দু'বার করে এসে টাকা ট্যাঁকে গুঁজে চলে যায়! রাজার এ কি অবিচার!····ব্রাহ্মণের এ দান বন্ধ করতে হবে।

মনে মনে ফন্দী এঁটে সে সেদিন করলে কি—রাজার কাছ থেকে দান নিয়ে ব্রাহ্মণ রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পথে চলেছেন····পুরুত হন্‌হনিয়ে পিছন থেকে ডাকলো—বলি, শুনছো, ও বামুন-ঠাকুর····

····কে ডাকে?····ব্রাহ্মণ পিছন ফিরে দেখেন—মাথায় লম্বা টিকি আর ইয়া জালার মত ভুঁড়ি····রাজপুরীর পুরুত!····ব্রাহ্মন বললেন— আমাকে ডাকছেন?····

—হ্যাঁ, হ্যাঁ····তোমাকে ডাকছি না তো কি ভগবানকে ডাকছি!

পুরুতের মুখে কথা নয় তো, যেন বিছুটির ঝাপ্‌টা!

পুরুত বললে—তোমার গলায় দেখছি পৈতে····মাথায় দেখছি টিকি····বামুন মানুষ! বামুন হয়ে এমন আহাম্মক····আদব কায়দা জানো না! রাজার সঙ্গে কথা কইতে যাও, রাজার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথা কও কেন?····তুমি কথা কও····আর তোমার মুখের যত থুতু ছিট্‌কে রাজার গায়ে লাগে—সে খেয়াল নেই!····

ব্রাহ্মণ মহা চিন্তিত হলেন····হয়ে বললেন—আজ্ঞে উনি কাছে ডাকেন····

পুরুত বললে—বেশ তো, কাছেই না হয় গেলে····কথা কইবার সময় রাজার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা কইতে পারো না?····তাহলে তো আর রাজার মুখে থুতু লাগে না!····

ব্রাহ্মণ বললেন—আজ্ঞে, এবার থেকে তাই করবো !....

ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। পুরুত ফিরলো রাজার সভায়....ফিরে রাজাকে বললে—আপনি ঐ হতভাগা বামুনটাকে টাকা দেন, মহারাজ !

রাজা বললেন—হ্যাঁ···বেচারী গরীব····ব্রাহ্মণ।

পুরুত বললেন—গরীব হলে কি হয়! জানেন না তো, ও কি জাতের ব্রাহ্মণ !....আপনি টাকা দিলেন, আর সেই টাকা নিয়ে ও তাড়ির দোকানে ঢুকে একভাঁড় তাড়ি খেলে !....ও নেশার জন্য টাকা নেয়....মহা মিথ্যাবাদী।

রাজা বললেন—বটে! ব্রাহ্মণ হয়ে নেশার জন্য যদি ও টাকা নেয়, তাহলে ওকে সাজা দেবো।

পুরুত বললে—সাজাই ওর পাওয়া উচিত, মহারাজ !....

পরের বার ব্রাহ্মণ এলেন রাজার কাছে—টাকা নিতে। পুরুতের কথা মেনে ব্রাহ্মণ এবার রাজার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাজার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। রাজা ভাবলেন, তাড়ি খায়....মুখে তাড়ির গন্ধ....তাই তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা কইছে।

রাজার খুব রাগ হলো। তিনি স্থির করলেন, ব্রাহ্মণকে সাজা দেবেন....তবে, এখানে নয়। রাজার ছোট ভাই আরেক দেশের রাজা ...সেই ভাই রাজার নামে তিনি একখানা চিঠি লিখলেন....লিখে, খামে ভরে সেই চিঠি ব্রাহ্মণকে দিয়ে রাজা বললেন—এই চিঠি নিয়ে তুমি আমার ভাই-রাজার কাছে যাও। এ চিঠি তাঁকে দিলে, তুমি বেশ উচিত-মতো দান পাবে। আজ, এখনি যাও....দেরী করো না।....

রাজার চিঠি নিয়ে ব্রাহ্মণ পুরী থেকে বেরুলেন। পুরুত সভায় ছিল....সে শুনলো রাজার কথা....দেখলো, ব্রাহ্মণকে রাজা দিলেন চিঠি ....ভাই-রাজার কাছে ব্রাহ্মণ উচিত-মতো দান পাবে! পুরুত ভাবলো, তাই তো, রাজার এ কি মতি হলো! ব্রাহ্মণকে কোথায় সাজা দেবেন, না, তাকে পাঠালেন ভাই-রাজার কাছে বেশ মোটা রকমের দান নিতে !....

পুরুত এলো পুরী থেকে বেরিয়ে....পথে ব্রাহ্মণকে ধরে বললে—শোনো ঠাকুর, ভাই-রাজার রাজ্য অনেক দূরে....তুমি এখানে এসে আবার সেখানে চলেছো....বড় কষ্ট হবে। আমি ভাই-রাজার কাছেই যাচ্ছি দান নিতে....তুমি তোমার ও-চিঠি আমাকে দাও। ভাই-রাজা তোমাকে যা দেবেন, এনে আমি তা তোমাকে দেবো।....হ্যাঁ, আজ তুমি কিছু পাওনি....এই নাও, আমি তোমাকে দিচ্ছি চারদিনের আটটি টাকা।....

ব্রাহ্মণ পিছন ফিরে দেখেন

এ কথা বলে আটটি টাকা ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে, তার হাত থেকে সেই চিঠি নিয়ে পুরুত-ঠাকুর এলো ভাই-রাজার রাজ্যে। ব্রাহ্মণ ভাবলেন—পুরুত-ঠাকুরটির খুব দয়া আমার এতখানি কষ্ট বাঁচালেন!

ব্রাহ্মণ ফিরলেন নিজের বাড়ী....পুরুত ওদিকে সেই চিঠি নিয়ে ভাই-রাজার পুরীতে এসে পৌঁছুলো....তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

দাদা-রাজার পুরুত এসেছে....খাতির করে পুরুতের মুখ-হাত ধোবার জল আনিয়ে দিয়ে ভাই রাজা বললেন—কি খবর ?....

পুরুত বললে—আপনার নামে চিঠি আছে, মহারাজ !....চিঠি ! দাদা-রাজা লিখেছেন—

ভাই,

এ ব্রাহ্মণ অতি বদ....নেশা করে। এ রাজ্যে ও সাজা দেবো না। তাই তোমার কাছে পাঠালাম। তুমি ওকে সাজা দেবে—একটা থামে বেঁধে ওর পিঠে বিশ ঘা, বেত....তারপর, মাথা কামিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে, মুখে চূণ-কালি মাখিয়ে উল্টো গাধার পিঠে চড়িয়ে আমার রাজ্যে পাঠাবে তোমার লোকজনের সঙ্গে। ঢাক-ঢোলের বাদ্যি বাজিয়ে ওকে যেন আনা হয়। এইটিই হবে ওর উচিত সাজা।....

দাদা-রাজার চিঠি পড়ে ভাই-রাজা তখনি লোকজনকে হুকুম দিলেন—থামে পিছমোড়া করে পুরুতকে বেঁধে তার পিঠে লাগানো হলো বিশ ঘা বেত....তারপর, তার মাথা কামিয়ে দেওয়া হলো। পরের দিন ভোরে পুরুতের মুখে চূণ-কালি মাখিয়ে, তার মাথায় ঘোল ঢেলে উল্টো গাধার পিঠে চড়িয়ে তাকে পাঠানো হলো দাদা-রাজার রাজ্যে—সঙ্গে ভাই-রাজার লোক চললো বাদ্যি বাজিয়ে।

বিকেলবেলায় দাদা-রাজার রাণী তিনতলার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাধছেন, পথে শুনলেন—ঢাক ঢোলের বাদ্যি আর হৈ-হৈ রব ! শুনে তিনি পথের দিকে চেয়ে দেখেন—উল্টো গাধার পিঠে বসিয়ে পুরীর দিকে কাকে আনা হচ্ছে ! রাণী চিনলেন....সর্ব্বনাশ, এ যে আমার পুরুত ঠাকুর !....

রাণী ছুটে গিয়ে রাজাকে খবর দিলেন। খবর শুনে রাজা বেরিয়ে একেবারে ফটকের সামনে এলেন....তাঁকে দেখে তাঁর হাতে ভাই-রাজার লেখা চিঠি দিলে পুরুতের সঙ্গে-আসা লোকজনেরা। দাদা রাজা সেই চিঠি পড়লেন। ভাই-রাজা লিখেছেন—

দাদা,

তোমার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি। বদমায়েস বামুনটাকে তোমার কাঝে পাঠালুম।....

চিঠি পড়ে আর গাধার পিঠে পুরুত-ঠাকুরকে দেখে রাজা অবাক! ...গরীব ব্রাহ্মণকে দিয়ে তিনি চিঠি পাঠালেন, সেই ব্রাহ্মণকে সাজা দেবার জন্য....তার জায়গায় রাজবাড়ীর পুরুত-ঠাকুরের এ কি বিপত্তি!....

পুরুত ঠাকুরকে উল্টো গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে রাজা তাকে সভায় এনে বসালেন....বললেন—আপনার এ দশা কেন?

পুরুত-ঠাকুর কোন্ মুখে বলবে, কেন তার এ দশা! সে চুপ করে বসে রইলো। রাজা তখন সেই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়ে পাঠালেন। ব্রাহ্মণ এলে, রাজা বললেন—তোমাকে চিঠি দিলুম....চিঠি নিয়ে ভাই-রাজার কাছে যাবে।... তুমি গিয়েছিলে?....

ব্রাহ্মণ তখন বললেন সব বৃত্তান্ত....বললেন—পুরুত-ঠাকুর এসে আমাকে বললেন, তিনি যাচ্ছেন ভাই-রাজার কাছে....আমার চিঠি তিনি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন!....

তারপর রাজা সব কথাই শুনলেন....শুনলেন পুরুত-ঠাকুর ব্রাহ্মণকে বলেছিল—রাজার সঙ্গে কথা বলবার সময় সাম্‌নাসাম্‌নি কথা না বলে ব্রাহ্মণ যেন মুখ ফিরিয়ে কথা কয়, না হলে রাজার মুখে থুতু লাগবে!....

রাজা বুঝলেন পুরুতের অভিসন্ধি। পুরুতকে তিনি বললেন—ঠিক হয়েছে। হিংসুটে মানুষ....যেমন কর্ম্ম করেছো, তার ফল ভোগ করতে হবেই তো! আজ থেকে তোমার পুরুতগিরি খতম্। এমন বদলোককে দিয়ে পুরুতের কাজ করানো চলে না!....আমার রাজ্যে থেকে তোমার নির্ব্বাসন চিরদিনের মতো!....

ব্রাহ্মণকে রাজা বললেন—তোমাকে বাড়ী দেবো, ঘর দেবো.... তোমার ব্রাহ্মণীকে নিয়ে আজই তুমি এসো।....আজ থেকে তুমি হলে রাজপুরীর পুরোহিত।....

বহুকালের কথা। টাকা-পয়সার চেয়ে তখন বিদ্যার আদর ছিল অনেক বেশী। কথায় কথায় রাজারা রাজ্য দান করিয়া হাসিমুখে বনে চলিয়া যাইতেন। ঠাকুর দেবতার উপর মানুষের বিশ্বাস ছিল খুব এবং ভাগ্যকে লোকে বড় করিয়া দেখিত। ভাবিত, ভাগ্যে যা লেখা আছে, তার আর মার নাই!

সেজন্য দুঃখ-বিপদও বিস্তর সহিতে হইত!

কিন্তু সে কথা থাক।

এমন দিনে আরুণির মনে একদিন বৈরাগ্য জাগিল। টোলে বসিয়া কি একখানা পুঁথি পড়িতেছিল,—হঠাৎ মনে হইল, দুনিয়াখানা শুধু মায়া—মরীচিকা! সব মিথ্যা! মানুষ এত সাধনা করে জ্ঞানের জন্য—কিন্তু এ সাধনায় ফল! সবই তো মিথ্যা মায়া।

সব যদি মিথ্যা মায়া,—তবে সত্য কি?

আরুণির বয়স তখন ষোল বৎসর। এই মিথ্যা মায়ার ভূত ঘাড়ে এমন ভাবে চাপিয়া বসিল যে সে টোল ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া বনের পথে পাড়ি দিল।

যেন বনে গেলেই সত্য-বস্তুর দেখা পাইবে।

কত গ্রাম, নদী, পাহাড় পার হইয়া সে আসিল বনে। এ বনের আর শেষ নাই। গাছের পর গাছ ঝোপের পর ঝোপ—ক্রমে গাছে-ঝোপে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। কোথাও তার পথ নাই, রন্ধ্র নাই। আকাশ-ভরা আলো—তার একটি বিন্দু এ নিরন্ধ্র জঙ্গলে উঁকি দিতে পারে না। তার উপর, বাঘ, ভাল্লুক, সাপ—হুহুঙ্কারে বন একেবারে মূহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু সব মিথ্যা বলিয়া এ দুর্গম বনে যে আসিয়াছে, তার প্রাণ কি ভয়ে দোলে! আরুণির বুকও ভয়ে দুলিল না। বুক না দুলুক, পুঁথির পাতায় মিথ্যা বলিয়া দুনিয়ার গায়ে যত কালির তুলিই বুলানো হৌক, মানুষের এই মিথ্যা দেহখানারও সহিবার একটা সীমা আছে! কাঁটায় ছড়িয়া, পাথরে ছিঁড়িয়া ছেঁচিয়া আরুণির দেহখানা মিথ্যার মায়া কাটাইয়া সত্য সত্যই বড় পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল। পা চলিতে চায় না—হাত দুটা অবশ মাথা ঘুরিতে থাকে—চক্ষু মুদিয়া আসে—

আরুণির প্রাণ এক-একবার যেন চমক দিয়া বলে, এই যে যাতনা ভোগ করিতেছ, এ'ও কি মিথ্যা?

দেহ এ মিথ্যার মায়ায় ভুলিয়া থাকিতে পারিল না। একদিন দিনের শেষে বনের কোণে আরুণির দেহ মূর্চ্ছাতুর হইয়া ধূলায় লুটাইল। দুনিয়ার যে আলোটুকু এত মিথ্যা সহিয়াও চোখের সামনে জ্বলিতেছিল, সে আলো গেল নিভিয়া! নিরন্ধ্র বনের নিরন্ধ্র অন্ধকারে আরুণি চেতনা হারাইয়া বসিল। চোখ চাহিল কত বিলম্বে, আরুণি বুঝিল না। চোখ চাহিতে সে দেখিল, আলো! আর সেই আলোয় তার সামনে বসিয়া এক জটাজুটধারী ব্রাহ্মণ। পরণে গৈরিক—ব্রাহ্মণের দুটি চোখে যেন প্রদীপ জ্বলিতেছে!

আরুণি নিশ্বাস ফেলিল।

ব্রাহ্মণ ডাকিলেন—ব্রাহ্মণি—

ব্রাহ্মণী আসিলেন; তাঁর হাতে পর্ণপুট; পর্ণপুটে ঝর্ণার জল।

ব্রাহ্মণ কহিলেন—চোখ চেয়েছে মুখে একটু জল দাও।

ব্রাহ্মণী আরুণির মুখে জলের পাত্র ধরিলেন। আরুণি জলপান করিল।

আরুণি কহিল—আমি কোথায় ?

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমার আশ্রমে।

তারপর প্রশ্ন করিয়া ব্রাহ্মণ জানিলেন, আরুণির বৃত্তান্ত। কোথায় সে বাস করিত—এ বনে সে আসিল কেমন করিয়া—

ব্রাহ্মণ হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। বেশ আমার কাছে থাক। আমি তোমায় শিখাইয়া দিব, এ পৃথিবীকে পণ্ডিতের দল কেন মায়া বলেন—এবং তার মধ্যে সত্য আছে কতখানি।

ব্রাহ্মণের নাম সনাতন। আরুণি সনাতনের আশ্রমে রহিয়া গেল—তাঁর শিষ্য হইয়া। ব্রাহ্মণ পাঠ করেন, তপজপ করেন ; ব্রাহ্মণী বনফল সংগ্রহ করিয়া আনেন। তাহাতেই ক্ষুধার শান্তি হয়। নির্ঝরের জলে পিপাসা ঘোচে। গাছের বাকল আছে,—লজ্জা-নিবারণের উপায়। মানুষের অভাব মিটাইতে ইহার বেশী কি-বা চাই !

নগরে বিলাস আছে, তাই সেখানে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। সে সব সংগ্রহ করিতে আয়াসের অন্ত নাই। তারপর আছে পাশাপাশি বহু প্রতিবেশী। একের বিলাস দেখিয়া অপরের জাগে লোভ—তাহা লইয়া বিরোধ বিদ্বেষ—অতৃপ্তি হাহাকার মর্ম্মরিয়া ওঠে। সে অতৃপ্তির নেশায় হানাহানি কাটাকাটি—

এমনি করিয়া অভাব গড়িয়া অতৃপ্তি রচিয়া মানুষ নিত্য কত অশান্তি না সৃষ্টি করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছে।

এ বনে বিলাস নাই। তাই অভাবও নাই। অভাব নাই বলিয়া তাহাদের অভিযোগের নিশ্বাসে বাতাস পঙ্কিল হইয়া ওঠে না ! সত্যকার আরাম এই বনেই আছে।

আরুণি ভাবে, তাই কি ঐশ্বর্য-বিলাস মিথ্যা-মায়া-মরীচিকা বলিয়া সত্যকার জ্ঞানীরা উড়াইয়া দিতে চান !

বনের বাহিরে তুঙ্গভদ্রা নদী। সনাতন বলিলেন,—আমি তুঙ্গ-ভদ্রায় স্নান করতে যাবো আরুণি। তুমি আশ্রম রক্ষা করবে।

গুরু চলিয়া গেলেন—আশ্রমে রহিলেন ব্রাহ্মণী; আর আশ্রম পাহারায় রহিল আরুণি।

ব্রাহ্মণীর সন্তান হইল।

জন্মের চারদিনের দিন নিশীথরাত্রে ব্রহ্মা আসেন মানুষের ললাটে তার ভাগ্যলিপি লিখিতে। এ রীতি চলিয়া আসিতেছে বিশ্বসৃষ্টির প্রথম ক্ষণ হইতে।

নিশীথ রাত্রি। আরুণি জাগিয়া বসিয়া আশ্রম রক্ষা করিতেছে। সহসা সে দেখে, কে ঐ ছায়ায় মিশিয়া গোপনে সতর্ক পায়ে আশ্রমে প্রবেশ করে?

আরুণি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল—কহিল কে তুমি এত রাত্রে আশ্রমে চলেছ? ব্রহ্মা বিপদে পড়িলেন। সারা পৃথিবী জুড়িয়া তিনি এ কাজ করিয়া আসিতেছেন নিঃশব্দে! কাকপক্ষী কখনো তাঁর গতি উপলব্ধি করিতে পারে না। কেহ বাধা দেয় না—সহসা এ কি ব্যাপার!

কিন্তু মানুষের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জা করে। বিশ্বের দুর্জ্ঞেয় বিধি—মানুষ জানিয়া লইবে তাহাও চলে না।

অথচ উপায় নাই। আরুণি দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পথ দিবে না!

ব্রহ্মা সর্বজ্ঞ। তিনি বুঝিলেন, অপরে তাঁকে দেখিতে পায় না। আরুণি যে দেখিতে পাইতেছে তার কারণ সে সর্ববিদ্যা শিখিয়া প্রচণ্ড পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তার চক্ষু এড়াইয়া চলিবেন দেবতারও সে সাধ্য নাই! জ্ঞানের দৃষ্টি এমনি তীক্ষ্ণ, অমোঘ!

দায়ে পরিয়া তাঁকে বলিতে হইল,—পথ ছাড়ো বাপু। আমি হলেম ব্রহ্মা। তোমাদের ভাগ্য-বিধাতা। এসেছি আজ সনাতনের যে ছেলে হয়েছে তার ভাগ্যলিপি রচনা করতে।

বটে! আরুণি কহিল—আপনি ব্রহ্মা হলেও আমি গুরুর আদেশে আশ্রম রক্ষা করছি—কি করে আপনাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দি?

ব্রহ্মা বিপদে পড়িলেন। বহু যুক্তি, বহু তর্ক তুলিলেন। যাঁর মুখে বেদের সৃষ্টি—তাঁর তর্কে জোর কতখানি, সহজে বুঝিতে পারি।

আরুণি বলিল,—আপনাকে যেতে দিতে পারি। কিন্তু একটি সর্ত আছে,—এই ছেলের ললাটে কি লিখবেন, আমায় আগে বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন—আমি নিজেও তা জানি না বাপু! আমার এই কলম দেখছো! এই কলমের মুখে যে কথা আসবে, তাই লেখা হবে। পূর্বজন্মে যে যেমন কাজ করে আসে—তারি ফলে তার এ-জন্মের ভাগ্য লেখা হয়। এ বিধির উলট-পালট নেই। বুঝলে—। এখন পথ ছাড়ো—আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। পলে পলে পৃথিবীতে কত লোকের জন্ম হচ্ছে—আমায় এই রাত্রিটুকুর মধ্যে ত্রিভুবন ঘুরে সকলের ভাগ্য লেখা শেষ করতে হবে।

আরুণি করজোড়ে বলিল—তাহলে আমায় কথা দিন, এ ছেলের ললাটে যে ভাগ্য লিখবেন ফিরে যাবার সময় আমায় তা জানিয়ে যাবেন।

—বেশ বেশ—তাতে আমি রাজী আছি। তুমি এখন পথ ছাড়ো।

আরুণি পথ ছাড়িয়া দিল। ব্রহ্মা গেলেন আশ্রমের মধ্যে....

নিমেষে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আরুণি দ্বারপথে তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। ব্রহ্মা কহিলেন—শোন বাপু, এর ভাগ্যে যা লেখা হলো, তা শুনলে খুশি হবে না। কিন্তু সে কথা বলবার আগে তোমায় হুঁসিয়ার করছি,—যা বলবো, সে কথার যদি বাষ্পও তুমি কারও কাছে প্রকাশ করো, তো প্রকাশ করার চেষ্টামাত্রে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—বুঝেছো....

আরুণি সবিনয়ে জানাইল, এ কথা সে ঘুণাক্ষরেও কাহারো কাছে প্রকাশ করিবে না।

ব্রহ্মা কহিলেন,—ছেলেটি জীবনে বড় দুঃখকষ্ট পাবে। ওর দৈনিক বরাদ্দ দেখছি, একটি বলদ আর এক থলে ধান! এ ছাড়া আর হবে না। পূর্ব্বজন্মে বহু পাপ করে এসেছে—এ জন্মে তার ফল ভোগ করতে হবে।

আরুণি কহিল—বলেন কি ঠাকুর। এত বড় ত্যাগী সাধু বাপ—তাঁর ছেলে এমন দুর্দ্দশা ভোগ করবে।

কে তুমি এত রাত্রে আশ্রমে চলেছ ?

ব্রহ্মা কহিলেন—উপায় কি বলো বাপু। যে যেমন কাজ করবে, তেমনি তার ফল ভোগ হবেই! কিন্তু শোনো সাবধান এ কথা যা শুনলে, এর বিন্দুবিসর্গ কারো কাছে যেন প্রকাশ করো না। প্রকাশ করলে কি ঘটবে,—মনে থাকবে তো ?

আরুণি কহিল—কারো কাছে একথা প্রকাশ পাবেনা ঠাকুর। ভয় নেই।

—বেশ! ব্রহ্মা বিদায় লইলেন। বিস্ময়ে আরুণি নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। আরুণির মনে যে অস্বস্তি ধরিল, তার বিরাম ঘটিল না।

তিন বৎসর কাটিয়া গেল। চোখের সামনে ছেলেটিকে দেখিয়া অস্বস্তিও বাড়িতে লাগিল। এবং এ অস্বস্তির জ্বালা সহিতে না পারিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া আরুণি বন ছাড়িয়া বাহির হইল তীর্থভ্রমণে।

বহু তীর্থে ঘুরিল। বহু সাধু সন্ন্যাসী, মুনি জ্ঞানীর দর্শন মিলিল—কোথাও দীর্ঘকাল থাকিতে পারিল না।

এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহিরে প্রায় বিশ বৎসর কাটাইয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল সেই গুরু সনাতনের আশ্রমে।

আসিয়া দেখে, গুরু নাই, ব্রাহ্মণী নাই,—গুরুর সন্তান নাই—সে আশ্রম নাই। বনের বৃক্ষলতা আশ্রমটিকে গ্রাস করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সন্ধান লইয়া জানিল, গুরু, গুরুপত্নী মারা গিয়াছেন। তাঁদের মৃত্যুর পর গুরুর পুত্রটি বন ছাড়িয়া পাশে যে কপালী গ্রাম আছে, সেই গ্রামে গিয়া ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে। পুত্রটির নাম—নিধি।

আরুণি চলিল কপালী গ্রামে। নিধির দেখা মিলিল।

নিধি কুলির কাজ করে—ছোট তার কুটীর। কুটীরের সামনে ক্ষেত। একটি বলদ আছে। এই বলদ লইয়া নিধির স্ত্রী ক্ষেতে কাজ করে। অতি কষ্টে দিনাতিপাত হয়।

ব্যাপার দেখিয়া আরুণি নিশ্বাস ফেলিল। নিধিকে ডাকিয়া পরিচয় দিল। নিধি বলিল—আসুন আপনার কুঁড়েয়।

আরুণি কহিল—শোনো আমার কথা। যদি একথা মেনে চলতে পারো, তাহলে তোমাদের দুঃখ ঘুচবে। বুঝলে—কাল সকালে বিছানা থেকে উঠে তোমার ঐ বলদ আর একথলে যে ধান আছে ঘরে,

তা নিয়ে সোজা হাটে যাবে। হাটে গিয়ে যে দাম পাবে, তাতেই ঐ বলদ আর ধান বেচে ফেলবে। বেচে যে পয়সা পাবে, তার একটি কড়ি ঘরে নিয়ে আসবে না। সে পয়সায় চাল, ডাল, ঘী, আটা, তরীতরকারী কিনে আনবে। কাপড়-চোপড় কিনে আনবে! পারো দুচার জনকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ো। একটি পয়সা বা একটুকরো চালডাল পর্য্যন্ত রেখো না—বুঝলে। যদি আমার কথা মেনে চলো, তাহলে ঢের আরামে বাস করতে পারবে—দুঃখ ঘুচবে। নিধি অবাক্! পাগলের মত এ বলে কি! আরুণি কহিল—হাঁ করে কি ভাবচো?

সে কহিল—বেচে দিই, তারপর উপায়? ক্ষেতের কাজ চলবে কি করে সমস্ত বেচে দিলে?

আরুণি কহিল—তোমার ভাগ্য ঠিক চালিয়ে নেবে 'খন। যা বলছি শোনো—ভালো হবে।

নিধি আসিয়া তার স্ত্রীকে এ কথা বলিল। স্ত্রী বলিল—ছাখো, শ্বশুর মশায় ছিলেন মস্ত পণ্ডিত—ইনি তাঁর শিষ্য। ইনিও পণ্ডিত লোক। শোনো গো এঁর কথা। হয়তো ভালো হবে। না হলে ওঁর কি স্বার্থ এ কথা বলার?

—বেশ!

পরের দিন ভোরে নিধি ধানের বস্তা মাথায় তুলিয়া বলদের দড়ি ধরিয়া হাটে চলিল; গিয়া বলদ ও ধান বেচিয়া যে টাকা পাইল, তাহাতে চালডাল, কাপড়-চোপড় কিনিয়া গৃহে ফিরিল; ফিরিবার পথে পাঁচজন বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল।

সেদিনটি কাটিল চমৎকার। এমন আহার জন্মে নিধি করে নাই। কাপড় জামা—কিন্তু কাল? ঘরে যে কিছু সঞ্চয় নাই।

দুশ্চিন্তায় মাঝরাত্রে নিধির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

আরুণি বাইরের দাওয়ায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল। নিধি আসিয়া ডাকিল—ঠাকুর····

আরুণি কহিল—কি খবর?

নিধি কহিল—দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হচ্ছে না। কাল সকালে আহারের উপায় ?

আরুণি কহিল—উপায় পাবে তোমার গোয়ালে !

নিধি হতভম্ব ! পাগলা ঠাকুরের কথায় কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিল।

নিধি দাওয়ায় বসিয়া রহিল বাঁশের খুঁটিতে ঠেশ দিয়া !

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার আবেশ—বলদের ডাকে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া সে গোয়ালে গিয়া ঢুকিল ! ঢুকিয়া দেখে, একটা বলদ !

বাঃ !

আরুণির ঘুম ভাঙ্গিল। আরুণি ডাকিল—নিধি....

নিধি কহিল—আজ্ঞে....

আরুণি কহিল—দাওয়ার কোণে ঐ বস্তায় ওকি—ছাখো তো....

নিধি আসিয়া দেখে, সত্যই তো বস্তা ! এবং সে বস্তার মধ্যে ধান ! সোনার কুচির মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে !

আরুণি কহিল—মুখহাত ধুয়ে হাটে বেরিয়ে পড়ো—ঐ বলদ আর ধানের বস্তা বেচে যা পাবে, তাতে কালকের মতন—বুঝলে ! নগদ একটি পয়সা ঘরে রাখবে না। কাপড়-চোপড় কাল এনেছো....আজ বাসন-কোসন ! বুঝলে !

—যে আজ্ঞে !....

পর পর সাতদিন এমনি কাটিল। নিধির অভাব ঘুচিল।

আরুণি কহিল—আমার এই কথা মেনে চলবে নিধি। একটি দিন যেন এ কথার নড়চড় না হয় ! নড়চড় হলেই আবার সেই দুঃখ আর অভাবে পড়বে। বুঝলে—

—বুঝেছি ঠাকুর। কিন্তু তুমি....

আরুণি কহিল—এক জায়গায় বসে থাকা আমার চলে না, নিধি। আমি আজ রাত্রেই বেড়িয়ে পড়বো....

—আবার আসবে তো ?

—বলতে পারি না।....

রাত্রে আরুণি চলিয়াছেন গ্রাম ছাড়িয়া বনের পথে।....সহসা দেখে, বলদ তাড়াইয়া একজন লোক আসিতেছে—তার মাথায় ধানের বস্তা; লোকটি আসিতেছে গ্রামের দিকে।

আরুণি থমকিয়া দাঁড়াইল। লোকটি কাছে আসিল।

আরুণি চিনিল—আরে, এ যে ছদ্মবেশী দেবতা ব্রহ্মা!

আরুণি কহিল—কি ঠাকুর—প্রণাম।

ব্রহ্মা কহিলেন—আরুণি! তোমার কাছে ঐ নিধির ভাগ্যের কথা বলে' কি বিপদই না বরণ করেছি! রোজ রাত্রে নিধির গোয়ালে একটি করে বলদ আর দাওয়ায় এক বস্তা ধান জোগাতে জোগাতে পাগল হয়ে উঠলাম!....

হাসিয়া আরুণি কহিল,—ভাগ্য তা হলে মানুষের চেষ্টায় বদলানো চলে—ঠাকুর! নয়?

ব্রহ্মা কহিলেন—মানুষ বিদ্যাবুদ্ধির জোরে আমার লেখাও পালটাতে পারে—তা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝচি বৈ কি বাপু।
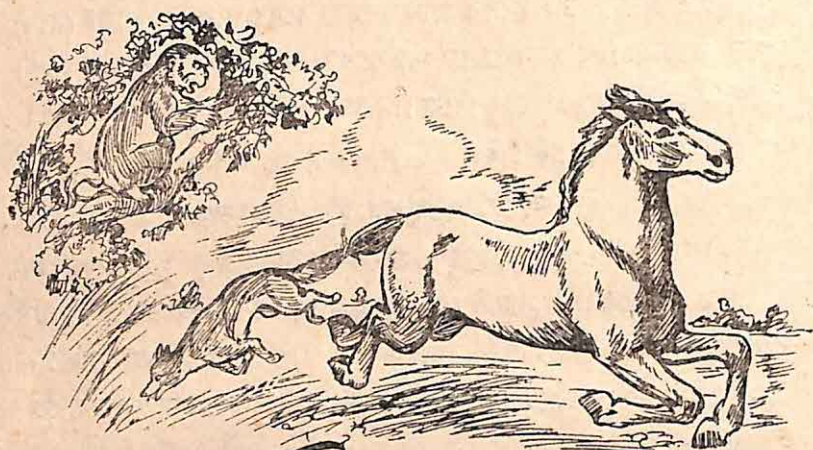
কি করে হলো

তোমরা রামায়ণ পড়েছো, কাজেই জানো যে, হনুমানের মুখ পুড়ে কালো হয়েছিল, লঙ্কার রাবণ রাজার হুকুমে তার ল্যাজে আগুন লাগাবার ফলে। বেচারী তখন সীতাদেবীকে বলেছিল এ পোড়া কালো মুখ নিয়ে কি করে ফিরে যাব মা ঃ সব বানরের মুখ রাঙা....আর আমার মুখ কালো। তখন সীতাদেবী বলেছিলেন হনুমানকে—তুমি গিয়ে সেখানে দেখবে, না পুড়লেও সব বানরের মুখ কালো !

এবং হনুমান ফিরে গিয়ে দেখেছিল দলের সব বানরের মুখ কালো।

সেই থেকে সব বানরের মুখ ছিল কালো। আমরা যাদের বলি —রূপী বানর তাদের মুখ রাঙা...কালো নয়।

যে-সব বানরের মুখের রঙ আজ দেখছি রাঙা তাদের আদি পুরুষ এমন একটি কাজ করেছিল—যার জন্য তার আর তার বংশের সব বানরের রঙ আজ হয়েছে রাঙা।

কি করে আজ রাঙা হলো,—তা জানতে পারবে এই চীনা গল্প

থেকে, তা জানবার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু নতুন কথা জানবে এখন শোনো সে কাহিনী বলি ঃ

শেয়াল···শুধু কি ধূর্ত ? মিথ্যা ধাপ্পাবাজি আর ফন্দী-ফান্দীতেও তার জোড়া নেই কোনো জানোয়ার ঃ কত জানোয়ার তার ধাপ্পার ভুলে কত বিপদে পড়েছে, তবু শেয়ালের ধাপ্পায় আজো তারা ভোলে। জানোয়াররা বসে মিটিং করে, সে মিটিংয়ে সকলে পণ করে শেয়ালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না—তাকে একঘরে করে রাখবে,—কিন্তু ধূর্ত শেয়াল এমন ধাপ্পা চালায় যে, জানোয়ারদের সে পণ আর রক্ষা হয় না।

গাছের ডালে বসে বসে এক বানর এসে দেখে। রাগে তার গা নিশপিশ করতে থাকে—শেয়ালের উপরে রাগ, জানোয়ারদের উপরেও রাগ। জানোয়ারদের উপরে তার বেশী—তাদের বলে, ওরে বোকার দল,—বারবার শেয়ালের ধাপ্পায় ভুলে হায়রাণ হচ্ছিস, তবু আবার তার কথায় কাণ দিস। বলা কিন্তু হয়না···জানে, বলা মিথ্যা···বলে' বুঝিয়ে উপদেশ দিয়ে কাকেও বুদ্ধি জোগান যায় না।

সে ভাবলো, ধূর্ত শেয়ালটাকে সে করবে জব্দ···তাকে এমন শিক্ষা দেবে, যে তারপর থেকে, হ্যাঁ। ভেবে ভেবে বানর মতলব ঠাওরালো। মতলব ঠাউরে সে নামলো গাছ থেকে—গাছের তলায় এক খরগোশ পুচ্ছ তুলে ফল খাচ্ছিল, তাকে ডেকে বানর বললে—শেয়ালটাকে জব্দ না করলে আর চলছে না—ওর শয়তানী দিনে দিনে বেড়েই চলেছে—কোনো জানোয়ারকে সে কেয়ার করে না! আমি ওকে জব্দ করবো! লম্বা দু-কাণ খাড়া করে খরগোশ শুনলো বানরের কথা। শুনে খরগোশ বললে—কি করে? বানর তাকে বললো, মতলব যা করেছে, সেই মতলব।

শুনে খরগোশ বললে—তুমি পাগল হয়েছো! শেয়ালের কত বুদ্ধি! শেয়াল তোমার কথা বিশ্বাস করবে কেন?

বানর বললে—আলবৎ করবে। জানো, যার বেশী বুদ্ধি, সে

আবার একটুতেই বেকুব বনে। তুমি এসো আমার সঙ্গে···তোমাকে কিছু করতে হবে না—শুধু বসে তুমি মজা দেখবে।

খরগোশকে নিয়ে বানর এলো শেয়ালের গর্তর কাছে···এসে খরগোশকে বললে তুমি ঐ ঝোপের আড়ালে চুপটি করে বসে থাকবে··· টু-শব্দটি নয়।···আমি ডাকবো শেয়ালকে···ডেকে—

খরগোশ গিয়ে বসলো ঝোপের আড়ালে আর বানর গিয়ে ডাকলো —শেয়াল শেয়াল বলি ও শেয়াল ভাই···

—কে ডাকে? বলে' শেয়াল এলো তার গর্ত থেকে বেরিয়ে।

বানর বললে—একটা কথা মনে হল যাচ্ছিলুম এখান দিয়ে—মনে হলো, শেয়াল ভাইয়ের অনেক বুদ্ধি···তাকে একবার জিজ্ঞাসা করি!

শেয়াল বললে—কি কথা?

বানর বললে—আচ্ছা, তুমি তো কত জন্তু-জানোয়ার-পাখীর মাংস খেয়েছো—বলো দিকিনি কোন্ জানোয়ারের কোন্ জায়গার মাংস সবচেয়ে ভালো খেতে?

হঠাৎ গর্ত থেকে ডেকে বার করে' এনে বানরের এ কি কথা! শেয়াল বললে—চট্ করে বলা শক্ত। যখন যে মাংস খেয়েছি, মনে হয়েছে এই মাংসই সবচেয়ে ভালো।

বানর বললে আচ্ছা শেয়ালভাই তুমি কখনো ঘোড়ার পিছলি পায়ের মাংস খেয়েছো? জ্যান্ত ঘোড়ার পিছলি-পা?

শেয়াল বললো—না।

বানর বললে—আঃ, অমন মাংস আর নেইরে ভাই। আমি সদ্য এক খাবলা সে মাংস খেয়ে আসছি।···খাওয়া শক্ত···ঘোড়া যে রকম চাট্ ছোড়ে!

নিশ্বাস ফেলে শেয়াল বললে—তাহলে?

কপাল কুঁচকে বানর যেন ভাবছে, এমনি ভাব দেখালো—শেয়াল ঠায় চেয়ে আছে বানরের পানে—বানর বললে—মানে, ওর ল্যাজের

সঙ্গে নিজের ল্যাজ বেঁধে তারপর খাওয়া···ঘোড়া ভয় পেয়ে ছোটে যদি, ছুটুক—ল্যাজের বাঁধন তো খুলতে পারবে না তুমি মজাসে তার পিছলি পায়ের মাংস খেতে খেতে যাবে।

শেয়াল বললে—কিন্তু ঘোড়ার ল্যাজের সঙ্গে আমার ল্যাজ বাঁধবো কি করে? প্রচণ্ড উৎসাহভরে বানর বললে আমি যেমন করে আমার ল্যাজ বেঁধে ছিলুম!—মানে চমৎকার একটা ঘোড়া···চার পা মুড়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল···পা টিপে টিপে আমি গিয়ে তার ল্যাজের সঙ্গে
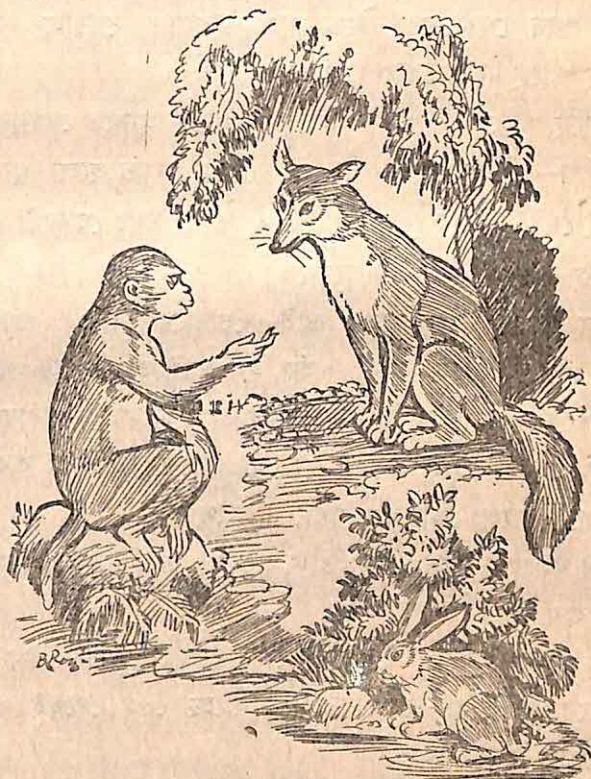
বানর বললে, আঃ অমন মাংস খাইনিরে ভাই···

বাঁধলুম নিজের ল্যাজ · বেঁধে তার পিছলি পায়ে—একেবারে তার ল্যাজ ঘেঁষে একটি কামড়··ভয় পেয়ে ঘোড়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল – যেমন ভাঙ্গা ঘোড়া উঠে দে ছুট · একেবারে তীরের বেগে ছুট ··তার ল্যাজে বাঁধা

আমার ল্যাজ···দুলতে দুলতে আমি মারি কামড়ের পর কামড়··· কিন্তু কত খাবো! তার আগে কলাবাগানে ঢুকে দু-কাঁদি মর্তমান কলা খেয়েছিলুম—তার উপর ছোট পেট···খানিক খেয়ে ল্যাজের গেরো খুলে লাফিয়ে পড়লুম।···কিন্তু মাংসের স্বাদ যা ওঃ, একেই তো মাংস বড় বেশী খাই না, তবু ঠিক করেছি, ঐ ঘোড়ার পিছলি পা'র মাংস ছাড়া আর কোনো জানোয়ারের মাংস খাবো না—হাতী, গণ্ডারের মাংস পেলেও···না!

কথা শুনে শেয়ালের জিভে নাল পড়লো। শেয়াল বললে—কাছাকাছি আছে নাকি কোনো ঘোড়া শুয়ে?

—আছে, আছে। বানর বললে—এখানে আসতে দেখলুম, খাশা একটা ঘোড়া—কী মাংস তার গায়ে। দেখে লোভ হলো খুব কিন্তু উপায় নেই পেট এমন দম্‌শম্ হয়ে আছে তার উপর ঘোড়াটা এখনো জেগে আছে—এখনি বোধ হয় ঘুমোবে।

শেয়াল বললে—যাবে বানর ভাই—ঘোড়াকে দেখি। তার কথা শেষ হবার আগেই বানর বললে—হ্যাঁ, হ্যা, তাইতো তোমার গর্ত দেখে তোমার কথা মনে হলো। ভাবলুম, শেয়াল ভাই মাংস খাবার যম··· তাকে দিই খবর। সেই জন্যেই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করলুম—সবচেয়ে খেতে ভালো কোন্ জানোয়ারের মাংস?

শেয়াল বললে—বেশ, বেশ, তাহলে চলো, এখনি চলো ঘোড়াটাকে দেখিয়ে দাও।

একটা ঘোড়া সত্যই পথে আসতে বানর দেখেছে···বেশ তেজী ঘোড়া···তবে ঘুমুচ্ছে না···চরে চরে ঘাস খাচ্ছে সেই দেখেই বানরের মাথায় জেগেছে এ মতলব।

শেয়ালকে নিয়ে বানর এলো···ঘোড়া দেখালো, হ্যাঁ খাশা শাঁসালো ঘোড়া বটে। লোভ হলো,—কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে এতটুকু তার সে লোভ প্রকাশ পেলো না। গম্ভীর মুখে শেয়াল বললে, দেখলুম তোমার ঘোড়া, ওর গায়ে শাঁস-মাষ আছে, মানি কিন্তু কোন্

জানোয়ারের মাংস সবচেয়ে খেতে ভালো—তা চট্ করে বলা যায় না! ভেবে দেখবো—তুমি মোদ্দা একথা আর কাকেও বলো না চুপচাপ থেকো।

এ কথা বলে ল্যাজ নেড়ে শেয়াল গেল চলে—বানরও গেল চলে। শেয়াল কিন্তু তখনি ফিরলো···নিঃশব্দে ফিরলো···ফিরে গাছ-পালার আড়াল থেকে ঘোড়াটিকে আবার দেখলো—দেখলো, ঘোড়ার খাওয়া হয়ে গিয়েছে···চারপা মুড়ে সে শোবার উদ্যোগ করছে।

শেয়াল সরে এলো সেখান থেকে···এসে চারিদিকে তাকালো, বানরটি কোথাও আছে কিনা?···না, বানরকে দেখলো না!···বাঁচা গেছে···ভাগীদার থাকবে না। একা রাজভোগ খাবে।

তখন বার বার এসে এসে দেখা—ঘোড়া ঘুমোলো কিনা···!

শেষে ঘোড়া ঘুমোলো····বেশ গাঢ় ঘুম—ঘোড়ার নাক ডাকছে। পা টিপে-টিপে এসে শেয়াল তখন নিঃশব্দে নিজের ল্যাজ বাধলো ঘোড়ার ল্যাজের সঙ্গে—টাইট গেরো। তার পর ঘোড়ার পিছলি পায়ের উরুতে বসালো একটি কামড়।

সে কামড়ে ঘোড়ার ঘুম ভাঙ্গলো...। চম্‌কে উঠে সে দাঁড়ালো ····পিছলি পায়ে তখন শেয়ালের দাঁত! ঘোড়া ভাবলো হলো কি! কাঁটা ফুটলো, না বিছে কামড়ালো! ভয়ে ঘোড়া ছুটলো....ছুটলো তীরের বেগে····।

ঘোড়ার সে দৌড়ের বেগে শেয়াল তার মাংস খাবে কি দুলতে দুলতে, ঝুলতে ঝুলতে সে নিজেকে সামলাতে পারে না। ঘোড়া ছুট্‌চে তো ছুট্‌চে—শেয়াল ল্যাজে বাঁধা····ঝুলছে, ঝুলছে পিঠে উঠে বসবে, সাধ্য কি তার।

বানর ওদিকে উঁচুগাছে বসে ঘোড়দৌড় দেখছে...তার ভারী মজা লাগছে—তারপর ঘোড়ার জোর দৌড়ের বেগে ল্যাজ ছিঁড়ে শেয়াল পড়লো ছিটকে···দড়াম্‌সে একেবারে বড় একটা পাথরের গায়ে····সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালের দুখানি পা ভাঙ্গলো।

গাছের ডালে বসে মজা দেখতে দেখতে বানরের কী আনন্দ… আনন্দে সে দুই বাহু তুলে ডালেই তাই ধেই-ধেই নৃত্য…নাচের দমকে বানর পড়লো হুমড়ি খেয়ে গাছ থেকে নীচে…মুখ থুবড়ে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে দু গালে চোট লেগে রক্ত জমে দু গাল টকটকে লাল। খরগোশ ছিল গাছতলায়—সেও দেখলো দুর্গতি…দেখে মজা পেয়ে খরগোশ এমন অট্টহাস্য হাসলো যে হাসির চোটে তার ঠোঁট গেল চড়াৎ করে চিরে!

সেই থেকে বানরের দু গাল হয়ে আছে টুকটুকে রাঙা…খরগোশের ঠোঁট সেই থেকে চেরা…আর শেয়াল? সেই থেকে ঘোড়া দেখলে শেয়াল সেদিকে একশ হাত দূরে সরে থাকে আর বানরকে একদম বিশ্বাস করে না—বানরজাতের উপরে শেয়ালের ভয়ানক রাগ!

পাশাপাশি

পাহাড়ের বুকে গাঁ। গাঁয়ে পাশাপাশি দু'খানা বাড়ী। একখানা বাড়ী খুব প্রকাণ্ড—বড়লোকের বাড়ী। বাড়ীতে যেমন জাঁক্ তেমনি জমক। বড়লোকের নাম শে-রিঙ্। আর একখানা বাড়ী পাহাড়ের গুহায় লতা-পাতা আর গাছের ডালের ছাউনি—গরীবের বাড়ী। গরীবের বাড়ী চাম্-বার।

শে-রিঙ্ ভয়ানক দেমাকী—দুনিয়ার কাকেও সে মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না—কারো দুঃখ বোঝে না নিজেকে নিয়েই সব সময়ে মত্ত! কেউ এসে যদি দু'পয়সা চায়, চোখ রাঙিয়ে তাকে বিদায় দেয়! টাকার ঝাঁজে মেজাজ তার সব সময়ে গরম হয়ে আছে!

গরীব চাম্‌বা মানুষটি কিন্তু খুব ভালো—সকলের উপরে তার দরদ—সকলের উপর মমতা। ব্যাঙটিকেও সে বলে, ভগবানের জাব! নিজের দুখানা রুটি থাকে যদি কেউ তার কাছে এসে বলে, কিছু খেতে দেবে চাম্‌বা। চাম্‌বা তখনি তাকে নিজের

একখানা রুটি দেবে। গরীব মানুষ—অভাব আছে তবু মেজাজ ভারী ঠাণ্ডা। কাকেও একটা কড়া কথা বলে না। চাম্‌বার গুহার ছাউনির দরজায় এক চড়াই আর তার চড়াইনী বাসা করে থাকে। চড়াইনীর কটা ছানা হয়েছে। চড়াই যায় চরতে, চড়াইনী বাসায় থাকে ছানাদের দেখে।········ছানারা একটু বড় হলো তখন চড়াইয়ের সঙ্গে চড়াইনীও বেরুলো চরতে। বাসায় ছানারা খেলা করছে····খেলা করতে করতে একটি ছানা বাসা থেকে ঝুপ করে গেল পড়ে····অন্য ছানারা কি করবে? তারা নেমে গিয়ে তাকে তুলে বাসায় আনবে, সে সামর্থ্য তাদের নেই! তারা জুলজুল করে চেয়ে আছে তার দিকে····কখন সন্ধ্যা হবে চড়াই আর চড়াইনী ফিরবে তখন তারা এসে ওকে দেখবে।

কিন্তু সন্ধ্যার আগেই চাম্‌বা বাড়ী থেকে বেরুবে, দেখে সদরে চড়াইয়ের ছানা পড়ে আছে। বাসা থেকে পড়ে গেছে····আহা! চাম্‌বা তাকে তুললো—তুলে দেখে ছানার একটি পা গেছে মোচ্‌কে ভেঙ্গে। ছানাকে বুকে করে ঘরে এনে চাম্‌বা তার পায়ে কি একটা গাছের পাতা ছেঁচে তার প্রলেপ লাগিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে তার ভাঙ্গা পা দিলে বেঁধে—দিয়ে ছানাকে তার বাসায় তুলে রেখে এলো।

* * * *

তার পর দিন যায় মাস যায় বছর গেল চলে, একদিন চাম্‌বা বাড়ীর সামনে রোদে কটি ধান শুকোতে দিচ্ছে এমন সময় একটা চড়াই পাখী এসে তাকে ডাকলো চাম্‌বা চাম্‌বা—চেয়ে চাম্‌বা দেখে, চড়াই পাখী—চড়াই পাখীর ঠোঁটে পাতার ঠোঙা! চড়াই বললে—"তুমি চিনতে পারছো না। আমি সেই চড়াই যখন ছোট্ট ছানা ছিলাম বাসা থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে ছিল—আমায় তুমি যত্ন করে তুলে নিয়ে গিয়ে ওষুধ দিয়ে আমার পা বেঁধে বাসায় এনে রেখেছিলে সেদিনের কথা আমি ভুলিনি, চাম্‌বা—তাই তোমার জন্য এই জিনিষ এনেছি····নাও।"

একথা বলে পাতার ঠোঙা চড়াই দিলে চাম্‌বার হাতে। ঠোঙা খুলে চাম্‌বা দেখে গাছের বীজ।

চড়াই বললে—"শোনো আমি সত্যিকারের চড়াই পাখী নই, আমি পরী....কে কেমন মানুষ....পাখী হয়ে উড়ে উড়ে দেখে বেড়াই'.... তুমি এই বীজ যত্ন করে পুঁতে দাও তোমার ঘরের সামনে ছোট্ট এই বাগানে।'

এ কথা বলে চড়াই গেল উড়ে।

পাখী কথা কয়—তার উপর কবেকার সে কথা মনে রেখেছে.... চাম্‌বা খুব একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন শুনলো, সত্যিকারের পাখী নয়—পরী, তখন কি আহ্লাদ যে হলো তার! পরী এ বীজ এনে দেছে, নিশ্চয় সামান্য বীজ নয় তাহলে! চাম্‌বা বীজ পুঁতে দিলে তার বাগানে।....তারপর দুঃখে-ধান্দায় সে ভুলে গেছে...বীজের কথা। একদিন সকালে উঠে চাম্‌বা দেখে সে বীজে চমৎকার একটি গাছ হয়েছে—আর সে গাছের ডালে ডালে ফুল—কত রঙের ফুল। লাল, সবুজ, সাদা, হলদে, নীল। চাম্‌বা ডালি এনে ফুল পাড়তে লাগলো। লালফুল পাড়লো—পাপড়িগুলো থেকে ঝর্ ঝর্ করে পড়লো বড় বড় লাল চুণী....সাদা ফুল পাড়লো...... হীরের ঝকঝকে কুচি ঝরলো...সবুজ ফুলের পাপড়ি থেকে ঝরে পড়লো এত পান্না....হলদে ফুল পাড়তেই সোনার গুড়োর কুচি যেন, চাম্‌বা মহাখুশী—সেই সব চুণী পান্না হীরে আর সোনার গুঁড়ো ঘরে এনে রাখলো...একদিন নয়....রোজ সকালে গাছে এমনি করে ফুল ফোটে...রঙীন ফুল....আর চাম্‌বা পায় সেই সব ফুলের পাপ্‌ড়ি থেকে চুণী, পান্না হীরে আর সোনার কুচি।

দেখতে দেখতে চাম্‌বা খুব বড় লোক হয়ে উঠলো। চুণী পান্না বেচে বেচে অনেক টাকা হল। সে টাকায় চাম্‌বা তৈরী করলো পাথরের মস্ত বাড়ী—সে বাড়ীর কি বাহার! তার বাড়ীর পাশে শে-রিঙের বাড়ী—দেখায় যেন এতটুকুন। বড়লোক হলেও

চাম্‌বার মেজাজ কিন্তু রইলো আগেকার মতো ঠাণ্ডা-নরম····সকলের উপর তেমনি দরদ মমতা····গরীব-দুঃখীদের ডেকে ডেকে সে দেয় পয়সা-কড়ি···খাবারদাবার পোশাক আশাক।

চাম্‌বার ধনদৌলত দেখে শে-রিঙের কি হিংসা ; এমন লোক অনেক আছে পৃথিবীতে····নিজেদের অনেক টাকা-কড়ি থাকলেও যদি অন্য লোকের অনেক টাকা হচ্ছে দেখে, তাহলে হিংসায় তারা জ্বলতে থাকে। শে-রিঙ ঠিক সেই স্বভাবের মানুষ।—সে থাকতে পারল না —এলো চাম্‌বার বাড়ীতে কি করে এত ধনদৌলত হলো তোমার, বলো তো? চুরি? না, ডাকাতি? যখের ধন না—

হেসে চাম্‌বা বললে ; চুরিও করিনি ; ডাকাতিও করিনি মশায়····যখের ধনও পাইনি····আমার এ ধন দৌলত····

চাম্‌বা বললে শে-রিঙকে সেই চড়াইয়ের কাহিনী···। শুনে শে-রিঙ আর দাঁড়ালো না····বাজার থেকে কিনে আনলো একটা চড়াই আর একটা চড়াইনী...একরাশ ছানাশুদ্ধ কিনে এনে নিজের বাড়ীর ফটকে তাদের জন্য বাসা তৈরী করিয়ে সেই বাসায় রাখলো চড়াইদের।

তারপর কেবলি দেউড়িতে আসে—এসে দেখে, ছানা পড়লো কি না—কিন্তু পড়ে না ; ভারী মুস্কিল তো। টাকা খরচ করে চড়াই কিনে আনা, টাকা খরচ করে তাদের বাসা তৈরী—টাকা খরচ করে রোজ-রোজ এদের খোরাক জোগান—এমন পাজী ছানাগুলো যে, কিচ্ছুতেই একটা বাসা থেকে নীচে পড়ে না। শে-রিঙের দাঁত কিড়মিড় করে উঠলো রাগে...কত আর ধৈর্য ধরে থাকবে····ওদিকে চাম্‌বা রোজ রোজ পাচ্ছে এত এত হীরে পান্না চুনী—সোনার কুচি বড্ড বেশী বেশী বড়লোক হচ্ছে চাম্‌বা····আর শেরিঙ····

একটি লাঠি এনে শেরিঙ দিতে লাগলো চড়াইয়ের বাসায় খোঁচা সে খোঁচা খেয়ে একটা ছানা পড়লো বাসা থেকে নীচে পাথরের উপর—কিন্তু এমন বরাত, তার পা ভাঙ্গলো না। তখন শে-রিঙ ছানাকে তুলে তার একখানা পা দিলে মোচকে ভেঙ্গে তারপর

তার ভাঙ্গা পায়ে পাতাছেঁচা রস লাগিয়ে রেশমী সূতো জড়িয়ে বাঁধলো বেধে ছানাটাকে বাসায় তুলে রাখলো।

পরের দিনই কিন্তু বাসা খালি করে চড়াই আয় চড়াইনী উড়ে গেল ছানাদের নিয়ে।

—তাদের আর পাত্তা রইলো না।

রাগে গর্‌গর্‌ করে শে-রিঙের দিন কাটে—কোথায় কি মিথ্যা কতকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। তার বরাতে পাখীও হলো বেইমান!

ছ'মাস পরে একদিন চড়াই এলো—তার ঠোঁটে পাতার ঠোঙা··· চড়াইকে কিছু বলতে হলো না। পাখীর ঠোঁটে ঠোঙা দেখে দুহাত বাড়িয়ে শে-রিঙ বললে—এই যে ঠোঙো এনেছো, তবু ভালো। আমি ভেবেছিলাম একেবারেই ফেরার হয়ে থাকবে। পাখী ঠোঙা দিল, দিয়ে বললে, ঠোঙায় গাছের বীজ আছে৷ তোমার বাগানে পুঁতে দিয়ো। ধমক দিয়ে শে-রিঙ বললে, জানি জানি, গাছের বীজ মানুষ বাগানেই পোঁতে, তোমার আর জ্যাঠামি করতে হবে না। তুমি এখন ভাগো তো।

চাড়াই উড়ে গেল-শে-রিঙ পুঁতলো গাছের বীজ দেউড়ির পাশে তার যে মস্ত বাগান, সেই বাগানে।

পরের দিনই সে বীজ থেকে এতবড় গাছ—আর গাছের মগডালে মস্ত একটি ফুল—চন্দ্র সূর্যির মতো প্রকাণ্ড ফুল—লাল টকটক করছে ফুলের রঙ!

শে-রিঙ ভাবলে, ও ফুল ছিঁড়লে কোন্‌ রাজার তোষাখানা না পাবো!

আঁকশি এনে মগডাল থেকে সে ফুল পাড়লো—পেড়েই পাপড়ি ধরে চড়চড় করে টান—পাপড়ি ছিঁড়তে ফুলের ভেতর থেকে—হীরে চুণী, পান্না, সোনার কুচি ঝরা নয় বেরুলো মোটা বেঁটে একটা মানুষ— মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী মুখখানা কি ভয়ানক দেখতে আর কি মোটা

ভুঁড়ি, লোকটার কাঁধে এত বড় ঝোলা, লোকটা বেরিয়েই বললে—এই যে শে-রিঙ!

শে-রিঙ ভয়ে কাঁটা কোনো মতে বললে, তুমি কে?

লোকটা বললে চিনতে পারছো না! আমি তোমার মহাজন আমার কাছে তুমি অনেক টাকা ধারো তুমি দেনদার আর আমি তোমার পাওনাদার আমার ঝোলার মধ্যে আছে বিশ প'চিশ বছরের। খাতা...তোমার কাছে থেকে দুলাখ, পাঁচ লাখ নয় অনেক লাখ টাকা পাই—তুমি ধারো—খাতার পাতায় পাতায় তার হিসাব কষা আছে—দ্যাখো আর দেরী নয়! আমার পাওনা কড়া-ক্রান্তিতে আদায় করে তবে এখান থেকে নড়বো! হাঁ-হাঁ এই বসলুম আমি তোমার দরজা চেপে!

কথা শুনে আর পাওনাদারের চেহারা দেখে শে-রিঙ একেবারে থ। এর সঙ্গে কখনো কোনো কারবার করেছে বলে মনে পড়ে না তো; লোকটা বললেন—কি ভাবছো মশায়—ধাপ্পা! তা নয় এই দেখত খাতা....পাতায় পাতায় তোমার হিসাব....

খাতা খুলে খুলে লোকটা দেখাতে লাগলো 'এক বছর, দু বছরের খাতা নয়—বারো বছরের খাতা—আর সব খাতার পাতায় লেখা শে-রিঙের হিসাব! শে-রিঙ যেন স্বপ্ন দেখছে....না, কৈ এর সঙ্গে কারবার কখনো না! কিন্তু খাতা কথায় বলে মহাজনের খাতা—ব্যাপারীর খাতা—খাতায় দেনার অঙ্ক যা দেখলো....

দেনার দায়ে শে-রিঙের বাড়ী, বাগান, ক্ষেত-খামার, টাকাকড়ি, ঘোড়া, গরু, ছাগল....মানে যা কিছু ছিল—পাওনাদার সর্বস্ব নিলে তার পাওনা-গণ্ডা! শে-রিঙের কিছু রইলো না....একটা কাণাকড়ি পর্যন্ত না!....থাকতে রইলো তার একটি ছেলে....ছেলের বয়স বারো-তেরো বছর—এই ছেলে ছাড়া কোনো কুলে তার আর কেউ ছিল না! তার হাত ধরে শে-রিঙ পথে এসে দাঁড়ালো....ভুঁড়িওয়াল পাওনাদারের কি মনে হলো—সে বললে শোনো মশায় তোমার ঐ গোয়ালখানা

ছেড়ে দিচ্ছি—কোথায় গিয়ে থাকবে—ঐ গোয়ালখানায় থাকতে পারো।

গোয়ালেই আশ্রয় নিলে শে-রিঙ....ছেলে রইলো সঙ্গে।

তারপর যে কষ্টে দিন চলে....এর ক্ষেতে কাজ করে—তার ছাগল দুয়ে নিয়ে আসে—কারো বা মোট বর—

ক'মাস পরে, চাম্‌বা এখন খুব বড়লোক—তার অনেক ঐশ্বর্য—চাম্‌বা এলো শে-রিঙের কাছে—বললে—আমি বিদেশে যাচ্ছি এক বস্তা সোনার গুঁড়ো তোমার কাছে রেখে যেতে চাই, শে রিঙ....আমার তোষাখানায় ধরেছে না—সেখানে তিল-ধরবার জায়গা নেই, তা কি বলো, রাখতে পারবে?

চড়াই পাখী এসে ডাকলো চামবা, চামবা,...

শে-রিঙ বললে, কেন পারবো না, আমার এতবড় গোয়ালের—এ ঘরে থাকবার মধ্যে আমি আর আমার ছেলে—অনেক জায়গা আছে—রেখে যেতে পারো তোমার সোনার বস্তা।

চাম্বা তখন সোনার গুড়োর বস্তা এনে শে-রিঙর ঘরে রাখলো—রেখে সে গেল বিদেশে।

শে-রিঙের মনে হলো বেশ হয়েছে। এ বস্তা চাম্বা রেখে গেছে আর কেউ তা জানে না। কতকাল সোনা-রূপার মুখ দেখিনি, ঐ সোনার গুঁড়ো যদি সরিয়ে রাখি কে জানবে?

শে-রিঙ করলে কি—চাম্বার বস্তা থেকে সোনার গুঁড়ো সরিয়ে নিজের বস্তায় রাখলো—রেখে, চাম্বার বস্তায় এক রাশ বালি-পুরে সেই বালির বস্তা রাখলো গোয়ালঘরের কোণে।

মাসখানেক পরে চাম্বা বিদেশ থেকে ফিরে এলো—এসে বস্তা নিয়ে গিয়ে দেখে, বস্তার মধ্যে সোনার গুঁড়ো নেই—শুধু রাশ রাশ বালি।

চাম্বা এলো শে-রিঙের কাছে কাছে, বললে,—এ কি ব্যাপার শে-রিঙ—আমি সোনার গুঁড়ো ভরা বস্তা রেখে গেলাম—আর তুমি আমাকে ফেরৎ দিলে বালির বস্তা।....

শে-রিঙ বললে—তাই নাকি! আশ্চর্য কথা তো।....তোমার সোনার গুঁড়ো বালি হয়ে গেছে। বরাত খারাপ হলে এমনিই হয়ে থাকে।

চাম্বা আর কোনো কথা বললে না—বাড়ী চলে এলো।

এর দু-তিন মাস পরে চাম্বা এক মঠ তৈরী করলো—এ মঠে যত ছেলে এসে লেখাপড়া শিখবে—লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। এর জন্য কাকেও মাহিনা দিতে হবে না—বিনা মাহিনায় লেখাপড়া শিখবে।

অনেক ছেলে মঠে এসে আছে—মঠে তারা লেখাপড়া শেখে, চাম্বা তাদের শুধু বিনা মাহিনায় লেখাপড়া শেখায় না তাদের খাওয়ায়-পরায়। মানে ছেলেদের জন্য বাপ-মাকে একটিপয়সা খরচ করতে হয় না। শে-রিঙ কিন্তু তার ছেলেকে মঠে দেয়নি—কি হবে লেখাপড়া শিখে? ছেলে তার সঙ্গে খাটে—খেটে বা রোজগার করতে পারে!

কিন্তু একদিন কি কাজে শে-রিঙকে বিদেশে যেতে হবে—বিদেশে দু-তিন মাস থাকতে হবে—যাবার আগে ছেলেকে নিয়ে শে-রিঙ এলো চাম্‌বার কাছে—বললে আমাকে বিদেশে যেতে হচ্ছে চাম্‌বা যতদিন না ফিরি, ছেলেটাকে যদি তোমার কাছে রাখো....আমার বাড়ীতে তো কেউ নেই আমি চলে গেলে কে আমার ছেলেকে দেখবে।

চাম্‌বা বললে—বেশ বেশ তোমার ছেলে এখানে থাকবে আমার মঠে—লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে!

ছেলেকে চাম্‌বার কাছে রেখে শে-রিঙ গেল বিদেশে....শে-রিঙ চলে যেতেই চাম্‌বা কোথা থেকে একটা বানর নিয়ে এলো—এসে বানরটাকে শেখাতে লাগলো কটা কথা—কথাগুলো হলো....

বাঁদর, বাঁদর হয়ে গেছি বাবা—বরাত খারাপ হলে এমনিই হয়ে থাকে!

শে-রিঙের ছেলে মঠে আছে—খায়দায় লেখাপড়া শেখে আর পাঁচজন ছেলের সঙ্গে!

ক' মাস পরে শে-রিঙ এলো বিদেশ থেকে ফিরে—ফিরেই চাম্‌বার মঠে এলো, বললে—আমার ছেলে? ঐ যে!

মঠে তখন ছেলেরা বসে পড়া করছে, ছেলেদের সঙ্গে বসেছে সেই বাঁদরটা।

বাঁদরের দিকে দেখিয়ে চাম্‌বা বললে—ঐ তোমার ছেলে।

আমার ছেলেটা! ঐ বাঁদরটা?....শে-রিঙ বলে উঠলো।

চাম্‌বা বললে—ওকে জিজ্ঞাসা করো ওর পরিচয়।

চাম্‌বা বানরের দিকে চেয়ে বললে—কি হয়েছে এঁকে বলো।

বানরকে যেমন শেখানো হয়েছে বানর বলে উঠলো—বাঁদর হয়ে গেছি বাবা, বরাত খারাপ হলে এমনিই হয়ে থাকে!

শে-রিঙের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! রাগ হলো! চালাকি! মানুষ কখনো বানর হয়! সে বললে,—চালাকি ছাড়ো চাম্‌বা—আমার ছেলে ও নয়! ছেলে ফিরিয়ে দাও।

চাম্‌বা বললে ঐ তো তোমার ছেলে নিয়ে যাও !

রেগে-ঝেঁজে শে রিঙ বললে,—মানুষের ছেলে কখনো বাঁদর হয়। তামাসা পেয়েছো ?

চাম্‌বা বললে,—কেন হবে না শে-রিঙ। সোনার গুঁড়ো বরাতের দোষে বালি হতে পারে যদি তো মানুষের ছেলে বরাতের দোষে বাঁদর হতে পারবে না কেন ?

একথায় জোঁকের মুখে নুন পড়লো। শে-রিঙ বুঝলো—বুঝে আর কথা নয় তখনি এলো নিজের ঘরে—চাম্‌বার সোনার বস্তা এনে চাম্‌বাকে দিয়ে বললে,—এই নাও তোমার সেই সোনার গুঁড়োর বস্তা—এখন দাও আমাকে আমার ছেলে ফিরিয়ে।

হেসে চাম্‌বা বললে—এই তোমার ছেলে নিয়ে যাও।

ছেলে নিয়ে শে-রিঙ ফিরলো ঘরে।

চীনের রাণী····এক হাজার বছর আগেকার কথা বলছি। রাণীর রাজত্ব····রাজ্যে রাজা নেই। রাণীর যেমন প্রতাপ, তেমনি অহঙ্কার! রাণী বলেন,—পুরুষ মানুষের চেয়ে মেয়ে মানুষ ঢের ভালো করে রাজ্য চালাতে পারে। পুরুষ মানুষদের সরিয়ে যত মেয়েদের রাণী দিয়েছেন বড় বড় চাকরি। রাজ্যের মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাপণ্ডিত, পাত্র-মিত্র অমাত্য সকলেই মেয়ে—অর্থাৎ এ রাজ্যে মেয়েরাই সর্বেসর্বা।

এমন অপমান! পুরুষ মানুষেরা চটে চক্রান্ত করছে, কি করে এই রাণীকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে রাজ্যটি আবার হাতে পাওয়া যায়! মুস্কিল এই যে রাজ্যে যত ফৌজ, সকলেই মেয়ে-মানুষ তাদের হাতে হাতিয়ার, তাদের দখলে রাজ্যের যত কেল্লা। পুরুষেরা হাতিয়ার পাবে কোথা থেকে? হাতিয়ার আর পল্টন না পেলে তো রাজ্য লাভ হয় না।

রাণী থেকে থেকে বেয়াড়া বেয়াড়া হুকুম দেন! একদিন তিনি হুকুম দিলেন রাজ্যে খাজাঞ্চিকে—আজ রাত্রে আকাশে যত নক্ষত্র উঠবে গুণে কাল সকালে আমার কাছে তার অঙ্ক পেশ করা চাই। না যদি পারো কিম্বা অঙ্ক ভুল হয় যদি তো তোমার চাকরি যাবে।

খাতাঞ্চির চক্ষু স্থির। আকাশের নক্ষত্র নাকি কখনো গোণা যায়! পারলো না অঙ্ক পেশ করতে....বেচারীর কত বছরের চাকরি—চক্ষের পলক পড়লো না—সে চাকরিটি গেল। আর একদিন রাণীর হুকুম হলো, বাগানের পুরুষ হেড মালিকে পরের দিন সকালে হিসাব দিতে হবে, সারা রাজ্যে যত ফুল-গাছ আছে সেঁ সব গাছে ফোটা ফুলের সংখ্যা কত। বেচারী পারলো না সে হিসাব পেশ করতে—তারো চলে গেল চাকরি।

এমনি করে রাণীর বেয়াড়া-হুকুম পালন করতে না-পেরে পুরুষ মানুষদের বড় বড় চাকরি গেল! পুরুষ মানুষেরা চক্রান্ত করছে কি করে এই বেয়াড়া রাণীকে সিংহাসন থেকে সরানো যায়। কিন্তু কিছুতেই উপায় মেলে না।

এক চীনা ছোকরা তার নাম তাঙ—সে যেন ক্ষেপে উঠলো। সে যেমন লেখাপাড়া জানে, বুদ্ধিও তার তেমনি শাণানো! সে বললে—ধেৎ এ রাজ্যে নাকি মানুষ থাকে? নিত্য রাণীর এমন বেয়াড়া-বেয়াড়া মর্জি! আমি আর একদণ্ড এ রাজ্যে থাকবো না!

এ কথা বলে সে বেরুলো রাজ্য ছেড়ে—তার সঙ্গে চললো তাঙের এক খুড়ো আর তার একজন বন্ধু। তিনজনে কত দেশ কত রাজ্য ঘুরলো কত রকমের মানুষ-জন দেখলো—আশ্চর্য আশ্চর্য মানুষ-জন।

এক রাজ্যে এসে দেখে,—মানুষদের মুখগুলো কুকুরের মুখ। সেই কুকুরের মুখ নিয়ে তারা সব সময়ে ঘেউ ঘেউ করছে। কোনো রাজ্যে মানুষরা পায়ে হেঁটে পথ চলে না—তাদের হাতগুলো পাখীর ডানার মতো—সেই ডানা মেলে তারা উড়ে উড়ে চলে। কোনো রাজ্যের মানুষগুলোর হাত এমন লম্বা যে নদীর ধারে বসে হাত বাড়িয়ে জলের অতল তল থেকে মাছ ধরে ধরে ডাঙ্গায় তোলে। কোন রাজ্যের মানুষ তাল গাছের মত লম্বা—কোথাও বা আঙ্গুলের মত সুন্দর সুন্দর মানুষ—তাদের ছেলেমেয়েগুলো যেন পিঁপড়ে। একটা রাজ্যে মানুষদের বুকের মাঝখানে এত বড় করে ফোকর....বুকে হাড় নেই,

পাঁজরা নেই। তাদের মধ্যে আবার যারা টাকা-পয়সাওয়ালা, তাদের বুকের সেই সব ফোকরে ডাণ্ডা গুঁজে সেই ডাণ্ডা ধরে তাদের চাকর বেয়ারারা মনিবদের নিয়ে পথে চলে—মনিবরা কষ্ট করে পায়ে হেঁটে চলে না।

এ সব দেশ, রাজ্য ঘুরে তিনজনে নামলো জাহাজ থেকে আর এক রাজ্যে! রাজ্যের নাম, ভদ্দরের দেশ। জাহাজ থেকে নেমে বড় সহর। সহরে ঢুকে দেখে পথে অগুণতি দোকান-পাট····আর হাট-

তাকে ডেকে তাঙ জিজ্ঞাসা করলে।
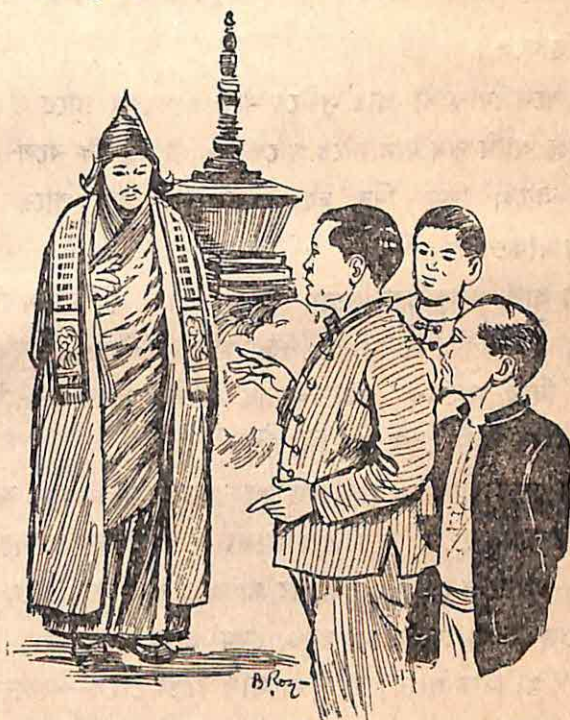
বাজার মানুষের প্রচণ্ড ভিড়—সকলে দারুণ ব্যস্ত হয়ে শুধু কেনাকাটা করছে—কথাবার্তা যা কইছে চীনা ভাষায়।

তিনজনে দাঁড়ালো একখানা দোকানের সামনে। দাঁড়িয়ে দেখে,—খদ্দের একরাশ জিনিষ কিনছে—সেগুলো বগলদাবা করে অত্যন্ত

বিনয়ের ভঙ্গীতে দেকানীকে বলছে—সে কি এ সব জিনিষ হলো বাজারে সব চেয়ে সেরা অথচ এ সবের দাম যা বলছেন, তা যে ন্যায্য দামের অর্ধেক! না না এতে কি বলে আমি এ সব কিনবো বলুন। আপনার লোকসান করতে পারবো না মশায়!

এ কথায় দোকানী আরো নীচু হয়ে জবাব দিলে—আজ্ঞে এ কথা বলবেন না। যে দাম আমি নিচ্ছি-ন্যায্য দাম তারো অর্ধেক হওয়া উচিত। সেজন্য আমার মন ভয়ানক খুঁৎ-খুৎ করছে মশায় আপনাকে আমি ঠকাচ্ছি বলে।

এ কথা বলে দোকানী প্রায় লুটিয়ে পড়ে খদ্দেরের পায়ে। খদ্দের বললে—কিন্তু আমি কম দাম দিয়ে পাপের ভাগী হই কি বলে—বলুন, —আপনি আরো কিছু নিন দয়া করুন আপনার পায়ে আমি গোলাম হয়ে থাকবো চিরদিন।

দোকানী হাত জোড় করে এসে বললে—যদি বেশী দাম দিচ্ছেন, ভাবেন বেশ, এর পরে যখন আবার কিছু কিনবেন—তখন হিসাব হবে। বাড়তি যদি দিয়ে থাকেন সেটা আমার কাছে জমা রইলো কিন্তু—আমার মনে হচ্ছে আমি বেশী দাম নিয়েছি।

এ রাজ্যে এমন ব্যাপার দেখে তাণ্ড তার খুড়ো আর বন্ধু অবাক। ....তারপর তিনজনে এলো আর এক রাজ্যে। এ রাজ্যে যে সব মানুষ পথে চলেছে—অপরূপ দৃশ্য! সকলের গা আর পাগুলো মেঘে ঢাকা শুধু মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে! তাও মেঘ এক রঙের নয়। হরেক রঙের মেঘ। গা আর পা কারো ঢাকা লাল রঙের মেঘে—কারো নীল মেঘে, কারো হলদে রঙে, কারো বা সবুজ মেঘে আবার কারো কালো মেঘে। দেখলে মনে হয়, যেন মানুষের মুণ্ডু পরে নানা রঙের কতক-গুলো মেঘ চলেছে পথে!

দেখে তাণ্ড অবাক! কোন মন্দিরের পুরুত চলেছিল পথে—তাকে ডেকে তাণ্ড জিজ্ঞাসা করলে—আমরা বেদেশী মানুষ এইমাত্র এদেশে এসেছি—এসে পথে এই যা দেখছি—মানুষের মাথা—পা দেখছি না

কারো। মাথার নীচে রকম রকম মেঘ—কিছু বুঝতে পারছি না ঠাকুর! এর মানে? এরা মানুষ চলেছে পথে? না কতকগুলো মেঘ?

পুরুত হাসলো, হেসে পুরুত বললে—এরা মানুষ। তোমাদের মতো মানুষ····হাত-পা গাওয়ালা মানুষ। তাঙ বললে—তাই যদি তো শুধু মাথাগুলো দেখছি—হাত পা, গা এমন রঙীন মেঘে ঢাকা কেন? তাও রকম-রকম রঙের মেঘ!

পুরুত বললে—মেঘগুলো হলো মানে যে যেমন স্বভাবের মানুষ—যেমন যেমন যার মন তেমনি তেমনি রঙের মেঘ তাদের। যার গা রামধনু রঙের মেঘে ঢাকা সে মানুষের মন জানবে সাঁচ্চা সাধা-সিদে মনের মানুষ সে—তার মনে খল-কপট নেই। লাল রঙের মেঘ—তার মানে সে মানুষটি দারুণ লোভী। সবুজ রঙের মেঘ—তার মানে—সে মানুস ভয়ানক কপট শঠ। নীল রঙের মেঘের মানে ও-মেঘে-ঢাকা মানুষের মুখে মধু মনে বিষ। কালো মেঘের মানে, মানুষটি ভয়ানক নীচ স্বার্থপর লোভী কপট—অর্থাৎ যত দোষ থাকতে পারে মানুষটির মন তার সব দোষে ভরা।

মেঘের মানে বুঝিয়ে দিয়ে পুরুত চলে গেল। তাঙ, তাঙের খুড়ো আর বন্ধু—তিনজনে চুপ করে পথের ধারে দাঁড়িয়ে। এমন সময়ে ছেঁড়া ময়লা ট্যানা পরা এক ভিখিরী চলেছে তাদের সামনে দিয়ে তার মাথার নীচে রামধনু রঙের মেঘ। একটু পরে একদল মানুষ এলো সার বন্দী হয়ে হাতে তারা লাল রঙের বড় ছাতা ধরে আছে আর সেই সব ছাতার আড়ালে-আড়ালে পর্দা ঢাকা এক রাশ কালো মেঘ চলেছে —কালো মেঘের উপরে মাথাগুলো ছাতার আড়ালে লুকানো—কেউ না তাদের মুখে মাথা দেখতে পায়।

এ সব দেখে সাথীদের নিয়ে তাঙ এলো নদীরঘাটে—ঘাটে জাহাজ —জাহাজে চড়ে তিনজনে দেশে ফিরলে। ফিরে এসে শুনলো রাণী মরে গেছে। তখন নিশ্বাস ফেলে তারা বললে সঙ্গীদের—আপদ যখন বিদায় হয়েছে—তখন আর এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াই কেন? দেশে থাকা যাক্।

—

তোমরা অনেকেই পড়েছো। বোধ হয়, রাইডার হাগার্ডের অপূর্ব গল্প "সলোমান রাজার খনি"—এই সলোমান ছিলেন ইশরাইলের রাজা ইহুদী-রাজ। খৃস্ট-জন্মের ৯৭৪ পূর্বে তিনি রাজা হন। তাঁর ছিল যেমন জ্ঞানবুদ্ধি, তেমনি ঐশ্বর্য। আমাদের দেশে রাজা বিক্রমাদিত্যের যেমন খ্যাতি,—রাজা সলোমার তেমনি খ্যাতি। তাঁর প্রতিপত্তিও ছিল অপরিসীম। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন।

তাঁর ঐশ্বর্য এবং জ্ঞানবুদ্ধির কত কাহিনীই না কত দেশের লেখক কতভাবেই না লিখেছেন। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির একটি কাহিনী বলছি,—শোনো।

তাঁর আমোলে মিশরে সেবা রাজ্যে ছিলেন রাণী, কুইন অফ সেবা নামে ইতিহাসে তাঁর প্রসিদ্ধি।

তাঁরো ছিল যেমন শক্তি, তেমন বুদ্ধি, তার উপর তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরা। তিনি শুনতেন রাজা সলোমানের ঐশ্বর্যের গল্প, জ্ঞান-বুদ্ধির গল্প,—কেমন তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, পরখ করবার জন্য রাণীর বাসনা হলো খুব তীব্র—তিনি এলেন তাঁর রূপসী সখীর দল আর সেপাই-সান্ত্রী

নিয়ে ইশারাইল রাজ্যে স্বচক্ষে রাজা সলোমানকে দেখতে এবং তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি প্রত্যক্ষ করতে। রাজা সলোমান তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। রাজার সভায় মণিমাণিক্য গাঁথা সিংহাসনে বসে রাজা সলোমান—সভায় বসেছেন জমকালো পোষাক পরা মন্ত্রী পাত্রমিত্র অমাত্যের দল,—রাণী এলেন রাজার সভায় তাঁর রূপসী সখীদের নিয়ে—সঙ্গে এনেছেন রাজাকে নজর দেবার জন্য কত রকমের সামগ্রী উপঢৌকন—মিশরের ঐশ্বর্যের অপূর্ব নিদর্শন !

রাজা আর রাণীর এ সাক্ষাৎ যেন সূর্য আর চন্দ্রের মিলন। রাজা যেমন বয়সে তরুণ এবং অপরূপ তাঁর রূপ রাণীও তেমনি বয়সে তরুণী এবং রূপে রূপময়ী ! তাঁর সখীরাও বয়সে তরুণীরূপে রাণার যোগ্যা সঙ্গিনী। রাজসভা রূপের-আলোয় আলো হয়ে উঠলো।

রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে রাণীর হাত ধরে রাণীকে বসালেন তাঁর পাশে আর একখানি রত্ন-সিংহাসনে।

তারপর উপঢৌকন-দান। রাজ্যের সেরা সেরা সামগ্রী এনেছেন রাণী—সে সব সামগ্রীর কতকগুলি রাণী তৈরি করেছেন তাঁর যাদু-মন্ত্রে আর কতকগুলি মিশরের সেরা শিল্পিদের হাতের তৈরি—এমন সামগ্রী রাজা সলোমান কখনো চোখে দেখেননি :

সে সব সামগ্রীর মধ্যে একটি সোনার তৈরি পাখী—এ পাখী ঠিক জীবন্ত পাখীর মতো ওড়ে আবার জীবন্ত পাখীর মতোই কত রকম বুলি বলে,—দেখলে কে বলবে, সত্যিকারের জীবন্ত পাখী নয়—সোনার পাখী, মানুষের তৈরি !

এমনি অসংখ্য সামগ্রী রাজা দেখলেন, সভার সকলে দেখলেন—দেখে যেমন বিস্মিত হচ্ছেন তেমনি শতমুখে শিল্পীর প্রশংসা করছেন !

রাণী বললেন তাঁর সখীদের—সেই দুটি ফুলদানী—ফুলদানীতে ফুলের তোড়া সমেত নিয়ে এসো।

গন্ধভরা নানা রঙের অজস্র ফুলে ভরা বড় বড় দুটি তোড়া—দুটি

অপরূপ ফুলদানীতে সাজানো সখীরা নিয়ে এলো। সে দুটি তোড়া রাজার সিংহাসনের সামনে রেখে রাণী বললেন রাজাকে মহারাজা, আপনার মতো জ্ঞানী দুনিয়ায় আর নেই—জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে আপনি হলেন দুনিয়ার সব মানুষের সেরা—আপনার যেমন ঐশ্বর্য, তেমনি প্রতিপত্তি আর আমি হলুম মিশরের ক্ষুদ্র রাজ্য সেবা—সেই সেবার অতি তুচ্ছ রাণী তার উপর জ্ঞানবুদ্ধিহীনা নারী—আপনার চরণে আপনার যোগ্য উপহার দেবো, এমন সামর্থ্য আমার নেই। তুচ্ছ কতকগুলো খেলনা আমি এনেছি আপনার চরণে উপহার দিতে। সে খেলনার সঙ্গে এনেছি এ দুটি ফুলদানীতে ভরে রঙ্গীন গন্ধফুলের দুটি তোড়ার মধ্যে একটি তোড়ার মধ্যে একটি তোড়া আসল সত্যিকারের ফুলে রচা আর একটি হলো আমার হাতের তৈরি নকল ফুলের তোড়া —মণিমাণিক্য দিয়া রচা ফুলের রঙে রঙ মিলিয়ে রচা। আপনি দেখে বলে দিন—এ দুটি তোড়ার মধ্যে কোন্‌টি আসল ফুলের—আর কোন্‌টি নকল ফুলের তোড়া। যেটি অসল ফুলের তোড়া, সেটি আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করুন—আমি তাহলে কৃতার্থ হবো। হাতে নিয়ে তোড়া দুটি পরখ করা চলবে না—চোখে দেখে বুঝে আসল সত্যিকারের তোড়াটি আপনি হাতে নেবেন।

একথা বলে রাণী হাসলেন—মৃদু হাসি। ভাবলেন, রাজা যদি ঠিক না ধরতে পারেন তাহলে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির দর্প খানিকটা মলিন হবে!

রাজা হাসলেন, রাণীকে বললেন—আমার জন্য এত সব সামগ্রী এনেছেন—আমাকে দিচ্ছেন তার জন্য আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি একথা বলে তিনি ফুলের তোড়া দুটি দেখতে লাগলেন—তোড়া স্পর্শ না করে বেশ একাগ্র দৃষ্টিতে। তাঁর যেমন বিস্ময় তেমনি দুশ্চিন্তা আশ্চর্য—হাতের ফুল এমন চমৎকার তৈরি যে, আসলের সঙ্গে কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই। ঐ পদ্মের দল, গোলাপের রাশি, জুঁইবেল····দুটি তোড়ার প্রত্যেকটি ফুল এক রকমের—ফুলের সঙ্গে সঙ্গে পাতা—বর্ণে-চেহারায় কোন তফাৎ নেই। দুটি তোড়ায় ফুলের শিশির কণা····

রাজা প্রমাদ গণলেন তাইতো ফুলে হাত না দিয়ে শুধু যে দেখে ঠিক করতে হচ্ছে কোন্ তোড়ার ফুলগুলি আসল, তোড়ার ফুল হাতের তৈরি—নকল!

রাজা চিন্তিত হলেন—সিংহাসন ত্যাগ করে ফুলদানী দুটির সামনে বসে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দুটি তোড়ার ফুল পরীক্ষা করতে লাগলেন—কোনো তোড়ার ফুলে একটুকু খুঁত আছে কিনা, যাতে করে আসল-নকলের—তফাৎ নির্ণয় করতে পারেন। বহুক্ষণ পরীক্ষা করবার পর তিনি দেখলেন, একটি তোড়ার একটি ডাঁটির পাতা শুকনো। তিনি ভাবলেন, এইটিই তাহলে আসল। সে তোড়াটি হাতে নেবেন—হঠাৎ

রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে রাণীর হাতধরে…

মনে হলো, ও তোড়াটি আর একবার ভালো করে দেখি। তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, এ তোড়াতেও একটি ডাঁটির পাতা ওটির পাতার মতোই শুকনো। তিনি চমকে উঠলেন,—তাইতো দুটি তোড়ার ফুলে পাতার তফাৎ নেই তো।

তাহলে ?

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। সভাগৃহ নিস্তব্ধ হয়ে চিন্তা করছেন, রাণী নিস্তব্ধ বসে রাজার দিকে চেয়ে আছেন....রাজার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছেন ঃ রাণীর মনে জয়ের উল্লাস। সভাশুদ্ধ সকলে নির্বাক বিস্ময়ে চাইছে একবার রাজার দিকে পরক্ষণে রাণীর দিকে।

রাজা চিন্তা করছেন···চিন্তা করছেন···হঠাৎ মনে হলো এখন বসন্তকাল—একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাইলেন সিংহাসনের পিছনে প্রকাণ্ড জানালা—সেই জানালার দিকে—জানালার সামনে মখমলের মোটা পর্দা। রাজা আদেশ দিলেন ও পর্দা সরাও। পর্দা সরানো হলো। প্রকাণ্ড খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক রৌদ্র আর বসন্ত বাতাসের প্রবেশ। সে জানলার নীচে বাহিরে ওদিকে রাজার প্রকাণ্ড বাগান—বাগানে বর্ণে-গন্ধে কত ফুল ফুটে আছে—গাছে গাছে··· বাগান আলো করে কত রঙের গোলাপ, পদ্ম, বেল, মল্লিকা, জুঁই···ফুলে ফুলে মৌমাছিরা উড়ে বেড়াচ্ছে দলে দলে···মৌমাছিদের গুঞ্জন রব শোনা গেল।

খোলা জানলা দিয়ে আসল মিশরী ফুলের গন্ধ বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়লো বাগানে—এক ঝাঁক মৌমাছি উড়তে উড়তে সভা-ঘরে ঢুকলো··· ঢুকেই তারা এসে বসলো আসল ফুলের তোড়ায়···

দেখে রাজা পেলেন অকূলে যেন কূল। তিনি তখন মৌমাছি-বসা ফলের তোড়াটি নিলেন হাতে!

রাণী উঠে রাজার সিংহাসনের সামনে প্রণিপাতে নিজেকে লুণ্ঠিত করে বললেন—ধন্য হলুম, কৃতার্থ হলুম আজ আপনার জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় প্রত্যক্ষ করে!

শেষ